হিন্দুসমাজের গড়ন

শ্রীনির্মলকুমার বসু

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশ ১৩৫৬

মূল্য আড়াই টাকা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা
মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা
৩·১

অধ্যায়সূচী

চিত্রসূচী

ভূমিকা

হিন্দুসমাজের গড়ন সম্বন্ধে ১৩৫৪ ও ১৩৫৫ সালে দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। বিশ্ব-ভারতীর সৌজন্যে সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে। সম্প্রতি অধ্যক্ষ ক্ষিতিমোহন সেন এবং অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় হিন্দুসমাজ-ব্যবস্থার সম্বন্ধে জাতিভেদ ও বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ নাম দিয়া দুইখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। নীহারবাবুর বৃহৎ একখানি ইতিহাস অনেক দিন ধরিয়া ছাপা হইতেছে, হয়তো অল্প-দিনের মধ্যেই প্রকাশিত হইবে। তাঁহারা যাহা লিখিয়াছেন, আমি তাহার পরিপূরক হিসাবে, নৃতত্ত্ববিদের দৃষ্টিতে ভারতীয় সমাজব্যবস্থাকে যে রূপে দেখিয়াছি, তাহাই প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। পাঠক যদি ইহার দ্বারা নৃতত্ত্বের সম্বন্ধে কুতূহলী হন এবং যদি হিন্দুসমাজের গড়ন সম্বন্ধে তাঁহার বুঝিবার কিছু সহায়তা হয়, তাহা হইলে নিজের চেষ্টাকে সার্থক জ্ঞান করিব।

৩৭ বোসপাড়া লেন, কলিকাতা ৩
১৩ জুন ১৯৪৯

শ্রীনির্মলকুমার বসু

গৌরচন্দ্রিকা

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাসগ্রহণ করিবার পর তাঁহার মনে হইল আর নবদ্বীপে বসবাস করা উচিত হইবে না। কোথায় যাইবেন কোথায় থাকিবেন, এই সমস্যা যখন তাঁহার চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে তখন একদিন তিনি ভক্তগণকে একত্র করিয়া বলিলেন,

যদ্যপি সহসা আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
তথাপি তোমা-সবা হৈতে না হব উদাস॥
তোমা-সবা না ছাড়িব যাবত আমি জীব।
মাতারে তাবত আমি ছাড়িতে নারিব॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে—সন্ন্যাস করিয়া।
নিজ জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লইয়া॥
কেহ যেন এই বোলে না করে নিন্দন।
সেই যুক্তি কর, যাতে রহে দুই ধর্ম্ম॥

তখন,

শুনিয়া প্রভুর এই মধুর বচন।
শচী পাশে আচার্য্যাদি করিলা গমন॥
প্রভুর নিবেদন তারে সকলি কহিল।
শুনি শচী জগন্মাতা কহিতে লাগিল॥
তেঁহো যদি ইঁহা রহে তবে মোর সুখ।
তাঁর নিন্দা হয় যদি তবে মোর দুখ॥
তাতে এই যুক্তি ভাল মোর মনে লয়।
নীলাচলে রহে যদি দুই কার্য্য হয়॥
নীলাচলে নবদ্বীপে যেন দুই ঘর।
লোকগতাগতি—বার্ত্তা পাব নিরন্তর॥
তুমি সব করিতে পার গমনাগমন।
গঙ্গাস্নানে কভু তাঁর হবে আগমন॥
আপনার দুঃখ সুখ তাহা নাহি গণি।
তাঁর যেই সুখ তাহা নিজ সুখ মানি॥

শুনি ভক্তগণ তাঁরে করেন স্তবন।
বেদ-আজ্ঞা যৈছে মাতা তোমার বচন॥
প্রভু আগে ভক্তগণ আসিয়া কহিল।
শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ হইল॥

অতঃপর মহাপ্রভু নীলাচলের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

গঙ্গাতীরে গেলা প্রভু চারিজন সাথে।
নীলাদ্রি চলিলা প্রভু ছত্রভোগ পথে॥

এই ছত্রভোগ পথ অবলম্বন করিয়া বৎসরের পর বৎসর গৌড় হইতে ভক্তগণ জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষ্যে এবং মহাপ্রভুর দর্শনলাভ করিবার জন্য শ্রীক্ষেত্রে গমন করিতেন। মহাপ্রভুও মধ্যে একবার ঐ পথ ধরিয়া মথুরা যাইবার অভিপ্রায়ে গৌড় পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। গৌড়ের প্রতি তাঁহার মমতার কারণ প্রকাশ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,

গৌড়দেশে হয় মোর দুই সমাশ্রয়।
জননী জাহ্নবী, এই দুই দয়াময়॥

কিন্তু ঘটনাচক্রে সেবার তাঁহার ব্রজদর্শনের যোগাযোগ ঘটে নাই এবং তাঁহাকে পুনরায় নীলাচলেই ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরে তিনি রায় রামানন্দ এবং স্বরূপ দামোদরের সহিত পরামর্শ করিয়া ছত্রভোগের প্রসিদ্ধ পথের পরিবর্তে উড়িষ্যার পশ্চিম-দিকে যে পর্বত এবং বনাকীর্ণ প্রদেশ আছে তাহা ভেদ করিয়া কাশী-ধামের অভিমুখে অগ্রসর হন। সেই সময়ের ইতিহাস শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে নিম্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে,

প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি প্রভু উপপথে চলিলা।
কটক ডাহিনে করি বনে প্রবেশিলা॥
নির্জন বনে চলেন প্রভু কৃষ্ণনাম লৈয়া।
হস্তী ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুকে দেখিয়া॥
পালে পালে ব্যাঘ্র হস্তী গণ্ডার শূকরগণ।
তার মধ্যে আবেশে প্রভু করেন গমন॥

ময়ূরাদি পক্ষিগণ প্রভুকে দেখিয়া।
সঙ্গে চলে, 'কৃষ্ণ' বলে, নাচে মত্ত হৈয়া॥
'হরিবোল' বলি প্রভু করে উচ্চধ্বনি।
বৃক্ষলতা প্রফুল্লিত সেই ধ্বনি শুনি॥
ঝারিখণ্ডে স্থাবর জঙ্গম আছে যত।
কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত॥
যেই গ্রাম দিয়া যান যাঁহা করেন স্থিতি।
সে সব গ্রামের লোকের হয় প্রেমভক্তি॥

মথুরা যাবার ছলে আসি ঝারিখণ্ড।
ভিল্লপ্রায় লোক তাঁহা পরম পাষণ্ড॥
নামপ্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার।
চৈতন্যের গূঢ়লীলা বুঝে শক্তি কার॥
বন দেখি ভ্রম হয় এই বৃন্দাবন।
শৈল দেখি মনে হয়, এই গোবর্দ্ধন॥
যাঁহা নদী দেখে তাঁহা মানয়ে কালিন্দী।
তাঁহা নাচে গায় প্রেমাবেশে পড়ে কাঁদি॥
পথে যাইতে ভট্টাচার্য্য শাক মূল ফল।
যাঁহা যেই পায়েন তাহা লয়েন সকল॥
যে গ্রামে রহেন প্রভু তথায় ব্রাহ্মণ।
পাঁচ সাতজন আসি করে নিমন্ত্রণ॥
কেহ অন্ন আনি দেয় ভট্টাচার্য্য স্থানে।
কেহ দুগ্ধদধি কেহ ঘৃত খণ্ড আনে॥
যাঁহা বিপ্র নাহি, তাঁহা শূদ্র মহাজন।
আসি সবে ভট্টাচার্য্যে করে নিমন্ত্রণ॥
ভট্টাচার্য্য পাক করে বন্য-ব্যঞ্জন।
বন্য-ব্যঞ্জনে প্রভুর আনন্দিত মন॥
দুই চারি দিনের অন্ন রাখেন সংহতি।
যাঁহা শূন্য বন—লোকের নাহিক বসতি॥
তাঁহা সেই অন্ন ভট্টাচার্য্য করে পাক।
ফলমূলে ব্যঞ্জন করে বন্য নানা শাক॥

পরম সন্তোষ প্রভুর বন্য-ভোজনে।
মহাসুখ পান যেদিন রহেন নির্জ্জনে॥
ভট্টাচার্য্য সেবা করে স্নেহে যৈছে দাস।
তাঁর বিপ্র বহে জলপাত্র বহির্বাস॥
নির্ঝরের উষ্ণোদকে স্নান তিনবার।
দুই সন্ধ্যা অগ্নিতাপে কাষ্ঠ অপার॥
নিরন্তর প্রেমাবেশে নির্জ্জনে গমন।
সুখ অনুভবি প্রভু কহেন বচন॥
শুন ভট্টাচার্য্য! আমি গেলাম বহু দেশ।
বনপথে সুখের সম কাঁহা নাহি লেশ॥
কৃষ্ণ কৃপালু আমায় বড় কৃপা কৈল।
বনপথে আনি আমায় বহু সুখ দিল॥
পূর্বে বৃন্দাবন যাইতে করিলাম বিচার।
মাতা গঙ্গা ভক্তগণ দেখিব একবার॥
ভক্তগণ সঙ্গে অবশ্য করিব মিলন।
ভক্তগণ সঙ্গে লৈয়া যাব বৃন্দাবন॥
এত ভাবি গৌড়দেশে করিল গমন।
মাতা গঙ্গা ভক্ত দেখি সুখী হৈল মন॥
ভক্তগণে লৈয়া তবে চলিলাম রঙ্গে।
লক্ষ কোটি লোক তাঁহা হৈল আমা সঙ্গে॥
সনাতনমুখে কৃষ্ণ আমা শিখাইলা।
তাঁহা বিঘ্ন করি বনপথে লৈয়া আইলা॥
কৃপার সমুদ্র দীনহীনে দয়াময়।
কৃষ্ণকৃপা বিনে কোনো সুখ নাহি হয়॥
ভট্টাচার্য্যে আলিঙ্গিয়া তাঁহারে কহিল।
তোমার প্রসাদে আমি এত সুখ পাইল॥
তেঁহো কহে—তুমি কৃষ্ণ বড় দয়াময়।
অধম জীব মুই মোরে হইলা সদয়॥
মুই ছার মোরে তুমি সঙ্গে লৈয়া আইলা।
কৃপা করি মোর হাতে ভিক্ষা যে করিলা॥
অধম কাকেরে কৈলে গরুড় সমান।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি স্বয়ং ভগবান॥

প্রথম অধ্যায়

অরণ্যবাসী কয়েকটি জাতির বৃত্তান্ত

মহাপ্রভু মহানদীর দক্ষিণতীরবর্তী যে পথ দিয়া পশ্চিম-অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন সে পথটি অপ্রসিদ্ধ হইলেও পুরাতন ছিল। কারণ মহানদী মধ্যভারতের যে অংশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বা যে স্থানের বৃষ্টিপাতের দ্বারা পুষ্ট হইয়াছে, পাহাড়ে-ঘেরা সেই সমতল প্রদেশ অন্তত খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতেই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। সমগ্র মহানদী কূলে সপ্তম হইতে দশম, একাদশ বা আরও পরবর্তী কালে অনেকগুলি মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। খরোদের শবরী দেবীর মন্দির, বড়ম্বার সিংহনাথ মন্দির, শ্রীপুর, মলহার, শিউরিনারায়ণ প্রভৃতি স্থানের মন্দির মহাপ্রভুর আবির্ভাবের বহুদিন পূর্বেই নির্মিত হইয়াছিল এবং বিখ্যাত তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইত। এসকল তীর্থস্থানে রাজপ্রসাদে ব্রাহ্মণপল্লী স্থাপিত হইলেও সিংহনাথ প্রভৃতি মন্দিরে পূজার অধিকার আজও অব্রাহ্মণ আরণ্য জাতির হস্তে অর্পিত আছে।

এইসকল জাতি যেমন নদীর কূলেও বাস করে তেমনই পার্শ্ববর্তী বনাকীর্ণ বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডেও বাস করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে হয়তো কন্ধ জুয়াঙ্গ শবর প্রভৃতি জাতিকে লক্ষ্য করিয়াই কৃষ্ণদাস গোস্বামী শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে 'পরম পাষণ্ড' শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকিবেন। তাহাদের মধ্যে জুয়াঙ্গ জাতির সহিত পাঠকের পরিচয়-বিধানের চেষ্টা করিব।

জুয়াঙ্গ জাতি

মহানদীর উত্তরভাগে ঢেঙ্কানাল পাল লহড়া এবং কেওনঝর নামে তিনটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল: সেগুলি এখন ভারতরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই তিন রাজ্যে জুয়াঙ্গ নামে এক জাতি বাস করে। পাল লহড়াতে

এখন পর্যন্ত জুয়াঙগদের মধ্যে একটি বিচিত্র ব্রত প্রচলিত আছে। বৎসরের মধ্যে কোনো একদিন জুয়াঙগগণ পাতার ঠোঙায় কিছু ফল সাজাইয়া বনের মধ্যে রাখিয়া আসে। মহাপ্রভু নাকি এক সময়ে ইহাদের নিকটে ফল ভিক্ষা করিয়াছিলেন; সেই প্রাচীন ঘটনার স্মৃতি আজও জুয়াঙগ জাতি এইভাবে বহন করিয়া আসিতেছে।

এই সকল জুয়াঙগদের বিশ্বাস যে, কেওনঝরের মধ্যে হোণ্ডা গ্রামের নিকটবর্তী গোনাসিকা পর্বত হইতে, যেখানে বৈতরণী নদী উৎপন্ন হইয়াছে সেইখানে, অতি প্রাচীন যুগে মাটি হইতে জুয়াঙগ জাতির প্রথম উদ্ভব হয়। তাহাদের ভাষায় জুয়াঙগ শব্দের অর্থ 'মানুষ'। অর্থাৎ যেখানে বৈতরণী নদীর উদ্ভব সেইখানেই মাটি হইতে মানুষেরও প্রথম উদ্ভব হইয়াছিল। জুয়াঙগেরা নিজেদের পত্রশবর নামেও অভিহিত করে। তাহার অর্থ হইল, তাহারা শবর জাতির সেই শাখা যাহাদের মধ্যে পত্র পরিধানের রীতি প্রচলিত আছে।

১৯২৮ সালের প্রারম্ভে আমি পাল লহড়া রাজ্যের মধ্যে কণ্টলা নামক এক গ্রামে জুয়াঙগ এবং শবরদের দ্বারা অধ্যুষিত পল্লীতে কয়েক সপ্তাহ অবস্থান করিয়াছিলাম। বাহির হইতে কোনো লোক আসিলে জুয়াঙগেরা স্বভাবতই সন্ত্রস্ত হয়। তাহারা প্রথমে মনে করিয়াছিল, আমি হয়তো কোনও অসদুদ্দেশ্য লইয়া সেখানে উপস্থিত হইয়াছি, সরকারী বনবিভাগের এলাকায় তাহারা যেসকল বস্তু অপরের অগোচরে সংগ্রহ করিয়া থাকে সম্ভবত তাহারই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছি। কিন্তু যেদিন আমি কণ্টলা গ্রামের অধিষ্ঠাতৃদেবতার নামে পূজো দিলাম এবং দুইটি মোরগ বলি দিবার পর সমস্ত গ্রামবাসীকে পেট ভরিয়া ভাত খাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলাম সেদিন হইতে আমাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিতে জুয়াঙগেরা আর ইতস্তত করে নাই।

পূজা

গ্রামদেবতার পূজার জন্য যে ব্যক্তির উপরে ভার দেওয়া হইয়াছিল সে কণ্টলা গ্রামের মাতব্বর। তাহার নাম মানি। পল্লীটিতে সবসুদ্ধ দশ-বারটি পরিবারের বাস; প্রত্যেকের বাড়িতে একটি উঠান আছে ও তাহার

চারিদিকে দুইতিনখানি করিয়া নীচু দোচালা ঘর। ঘরের দেওয়াল শালের বল্লা বা অন্য গাছের ডালপালা বুনিয়া তৈয়ারি, উপরে মাটির প্রলেপ। বনের ঘাস দিয়া চাল ছাওয়া। গৃহস্থদের ঘর দোচালা হইলেও গ্রামের প্রবেশমুখে একখানি অপেক্ষাকৃত বড়, কিন্তু নীচু চারচালা ঘর আছে। ইহাকে মজাঙ অথবা দরবার বলা হয়। মজাঙে পল্লীর অবিবাহিত যুবকেরা রাত্রে শুইয়া থাকে; সারাদিন পুরুষেরা বাঁশের কাজ করে, গল্পগুজব চলে। সামনে একখণ্ড পরিচ্ছন্ন খোলা জমি। রাত্রে সেখানে মেয়েরা পরস্পর সার বাঁধিয়া নৃত্য করে এবং পুরুষেরা তালে তালে চাঙগু নামক চামড়ার একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র বাজায়। চাঙগু ছাড়া জুয়াঙগদের অপর কোনো বাদ্যযন্ত্র দেখি নাই। চাঁদনি রাত হইলে সারা রাত ধরিয়া চাঙগুর বাজনা শোনা যায়; অন্য দিনও কিন্তু গভীর রাত্রি পর্যন্ত নাচ-গানের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়।

গ্রামে কোনো অতিথিসজ্জন উপস্থিত হইলে মজাঙে তাঁহার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হয়। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক গ্রামে মজাঙের মূল খুঁটা দুইটি গ্রামপ্রতিষ্ঠার সময়ে প্রথমে পোতা হইয়া থাকে বলিয়া জুয়াঙগদের বিশ্বাস, তাহাদের প্রধান দেবতাদ্বয়, বুঢ়ামবুঢ়া এবং বুঢ়ামবুঢ়ী ঐখানে বাস করেন। মজাঙে সর্বদা আগুন জ্বালা থাকে; যাহার প্রয়োজন সে আগুনে তামাকপাতার চুরুট ধরাইয়া লয়। চাঙগু বাজাইবার পূর্বে আগুনে সেঁকিয়া তাহার চামড়াকে টান করিয়া লওয়া হয়, নয়তো ভাল আওয়াজ বাহির হয় না। জুয়াঙগদের বিশ্বাস, চাঙগুর শব্দ হইল বুঢ়ামবুঢ়ার শব্দ; আগুনের মধ্যে তাঁহার শক্তি নিহিত আছে এবং সেই শক্তির প্রভাবেই চাঙগু সেঁকিলে পর বাজিতে থাকে।

জুয়াঙগ জাতির মধ্যে বিবাহের সংস্কার সম্পন্ন হইলে যে কোনো পুরুষই বুঢ়ামবুঢ়াকে পূজা করার অধিকারী হয়; তাহাদের সমাজে স্বতন্ত্র কোনো পুরোহিত শ্রেণী নাই। বিবাহের পূর্বে কেহ পূজা করিবার অধিকার লাভ করে না; সেরূপ ব্যক্তিকে বোধ হয় সমাজের পূর্ণ সভ্য বলিয়া গণ্য করা হয় না।

যেদিন আমার জন্য পূজা দেওয়া স্থির হইয়াছিল সেদিন মানি উপবাস করিয়া রহিল। পূজার জন্য জিনিসপত্রের যোগাড় শেষ হইলে

নদীতে স্নানের পর ধোয়া কাপড় পরিয়া সে মজাঙের সম্মুখে দুইটি ছোট কাল রঙের মোরগ, প্রায় এক সের ভিজা আলোচাল, একটি টাঙ্গি, আগুন ও ধুনা প্রভৃতি লইয়া উপস্থিত হইল। প্রথমে শালপাতা দিয়া ঠোঙা তৈয়ারি করিয়া তাহাতে তেল ও সলিতা দিয়া প্রদীপ জ্বালা হইল। মজাঙের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পূর্বদিকে মুখ করিয়া সূর্যের দিকে চাহিয়া মানি বলিতে লাগিল,

> সত্যা জেমতো মাসিকে তলে বাহাসিন্দরি উপরে ধর্মদেবতা
> বাবুরে আইঙ ডাগাতাইঙেগ সামুইসেরে। বেগাবেগি
> মোরনে ঠাররে।

তলে বসুন্ধরা, উপরে ধর্মদেবতা, তোমরা যেমন সত্য, [তোমাদের দোহাই দিয়া বলিতেছি] বাবুকে আমাদের ভাষা দান কর। শীঘ্র [আমাদের] ঠার [তাঁহার নিকটে] আনিয়া দাও।

অতি সহজ সরল ভাষা, বলিবার কথাও সোজা; কোনো মন্ত্রের বালাই নাই। নিত্যকার কথাবার্তার ভাষায় দেবতাকে স্বীয় প্রয়োজন জানাইয়া জুয়াঙেগরা পূজা করে, প্রার্থনা জানায়।

ইহার পর মানি গোবর দিয়া লেপা মাটির উপরে প্রথমে হলুদের গুঁড়া দিয়া তিনটি দাগ কাটিল এবং সেই দাগের উপরে আলোচালের নয়টি পিণ্ড দিল। প্রত্যেক পিণ্ড দিবার সময়ে এক একজন দেবতার নামে তাহা উৎসর্গ করিতে লাগিল। সেই সময়ে মানি বলিতে লাগিল,

> গলা বুঢ়ামবুঢ়ী পাইসেনা
> বুঢ়ামবুঢ়া পাইসেনামডে
> রুসিআণি আমডে পাইসেনা
> তলে বাহাসিন্দরি আমডে পাইসেনা
> উপরে ধর্মদেবতা আমডে পাইসেনা
> গলা পিতাসনি আমডে পায়েনা
> পত্রশঅরাণি আমডে পায়েনা
> লক্ষ্মীদেবতা আমডে পায়েনা
> জেতেকে বুঢ়ারিকি গলা বাবুকে ঠাররে
> মেডেঙেনাতে আফে পায়েসেনায়েতে।

আচ্ছা বুঢ়ামবুঢ়ী তুমি নাও। বুঢ়ামবুঢ়া, তুমি নাও। ঋষিপত্নী, তুমি নাও। তলে বসুন্ধরা, তুমি নাও। উপরে ধর্মদেবতা, তুমি নাও। আচ্ছা পিতাসনি (=পেত্নী), তুমি নাও। পত্র-শবরী, তুমি নাও। লক্ষ্মীদেবতা, তুমি নাও। [বাকি] যত বুঢ়ারা (=ঠাকুরদেবতারা?) আছ, আচ্ছা, বাবুকে আমাদের ভাষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তোমরাও এই নাও।

আলোচালের পিণ্ড নিবেদন করিবার পর কালো মোরগ দুটিকে সেইখানে একে একে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। তাহারা স্বেচ্ছায় যখন পিণ্ডের চাল খুঁটিয়া খাইতে লাগিল তখন বুঝা গেল যে, দেবতারা নিবেদিত অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন। তখন টাঙিগখানিকে মাটির উপরে চাপিয়া ধরিয়া মানি বঁটিতে কুটনো কোটার মত মোরগ দুইটির গলা কাটিয়া ফেলিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু তপ্ত রক্ত আলোচালের উপরে এবং কিছু মজাঙের চাঙগুলির উপরে ছড়াইয়া দিল।

এইরূপে পূজা শেষ হইবার পর গ্রামে সকলে মিলিয়া এক টাকায় খরিদ করা চাল রান্না করিয়া ভোজের ব্যবস্থায় মন দিল।

সংস্কৃতির রূপ

পাঠক লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, জুয়াঙগপল্লীতে অনুষ্ঠানটির মধ্যে স্নান ও উপবাস, ধূনা জ্বালার ব্যবস্থা, হলুদ আলোচাল প্রভৃতির ব্যবহার, লক্ষ্মীদেবতা, ঋষিপত্নী প্রভৃতির নামগ্রহণ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পরিচয় দেয়। আবার পুরোহিত শ্রেণীর অভাব, বিশিষ্ট মন্ত্রের অভাব, মোরগ বলি দেওয়া, বুঢ়ামবুঢ়া, বুঢ়ামবুঢ়ী প্রভৃতি দেবতার পূজা লৌকিক সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যের সাক্ষ্য দেয়।

পাল লহড়া অথবা ঢেঙ্কানালে জুয়াঙগদের জীবিকার উপায়ের সম্বন্ধে পর্যালোচনা করিলেও তাহাদের মৌলিক স্বাতন্ত্র্য এবং তদুপরি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাবের অনুরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। উল্লিখিত দুইটি স্থানে অপরাপর হিন্দু অধিবাসিগণের প্রভাববর্জিত অবস্থায় জুয়াঙগ জাতি কোন্ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিত, আজও সন্ধান করিলে তাহার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

পাল লহড়ার জঙ্গলে জুয়াঙ্গগণ অপেক্ষা বর্ধিষ্ণু এবং প্রতাপশালী এক জাতি বাস করে, তাহাদের নাম পাউড়ি ভুইঞা। পাউড়ি ভুইঞাদের মধ্যে অনেকে জুয়াঙ্গদের মত গভীর অরণ্যে পর্বতে অথবা স্বল্পপরিসর উপত্যকা আশ্রয় করিয়া বসবাস করে। গোরুবাছুর পালন করা অথবা লাঙলের সাহায্যে চাষ করার কাজে তাহারা অভ্যস্ত নয়। তাহারা জঙ্গলের মধ্যে কয়েক বিঘা জমির ঝোপঝাড় কাটিয়া প্রথমে অপেক্ষাকৃত বড় বড় গাছের মূলের নিকটে সংগ্রহ করে। বনের যে অংশ এইরূপে কামানো হইল, সেই অংশে তখন অগ্নিসংযোগ করা হয়। আগুনের ফলে মাটি খানিক খানিক পুড়িয়া যায়, পোকামাকড় ধ্বংস হয় এবং মাটির উপরে এক প্রস্থ ছাই জমা হয়। সেই মাটিতে তখন লোহার খন্তার সাহায্যে কিছুদূর অন্তর গর্ত করিয়া কয়েক রকমের বীজ বোনা হয়। পাহাড়ের মাটি যথেষ্ট উর্বর এবং এ অঞ্চলে বারিপাতও যথেষ্ট বলিয়া, চাষ না করা সত্ত্বেও পোড়াইয়া পরিষ্কার করা জমিতে দুই তিন বৎসর পর্যন্ত মন্দ ফসল হয় না। কিন্তু জমির তেজ যখন কমিয়া আসে তখন ভুইঞা অথবা জুয়াঙ্গগণ সরিয়া গিয়া নূতন বন-ভূমিতে কমান এবং দাহী করিবার আয়োজন করে। ইতিমধ্যে পূর্বের কামানো জমি আঠ দশ বছর পতিত থাকার ফলে আবার বনে আচ্ছন্ন হইয়া যায়; ততদিনে ভুইঞাগণ ঘুরিতে ঘুরিতে আবার হয়তো সেই জমিকে ব্যবহার করিবার চেষ্টা করে।

এইরূপে জঙ্গল পোড়াইয়া, শুধু খন্তার সাহায্যে যে চাষ হয় তাহার অসুবিধা হইল এই যে, একটি ছোট্ট জুয়াঙ্গ অথবা ভুইঞাপল্লীর খোরাক যোগাইবার জন্য বিস্তীর্ণ বনভূমির দরকার হয়; অথচ লাঙলের সাহায্যে চাষ করিলে সেই জমিতেই অন্তত দশগুণ লোকের পক্ষে পর্যাপ্ত খোরাক উৎপাদন করা সম্ভব হয়। তাহার মধ্যে কেহ হয়তো কামার ছুতার প্রভৃতির কাজ করিয়া অপরের উদ্বৃত্ত শস্যের সাহায্যে সহজেই জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারে; পরস্পরের সহযোগিতার বন্ধনে সকলেই লাভবান হয়। কিন্তু পাউড়ি ভুইঞা বা জুয়াঙ্গগণ পূর্বে সেরূপ উৎপাদনব্যবস্থার সহিত পরিচিত ছিল না, দাহী এবং কমানই করিত। দুঃখের বিষয়, দাহী এবং কমানের দ্বারা ভুইঞাদের খাদ্যাভাব

পুরাপুরি মিটে না; স্ত্রীলোকগণ প্রতিদিন পরিশ্রম সহকারে বন্য শাক-পাতা, কয়েক প্রকারের কন্দ, ঋতুবিশেষে কেন্দু, পিয়াল, মহুয়া প্রভৃতি গাছের ফল বা ফুল সংগ্রহ করিয়া থাকে। পুরুষেরা পূর্বে বনের পশুপাখী শিকার করিয়া কিছু খাদ্যব্যবস্থা করিত, কিন্তু তাহাদের সেই স্বাধীনতা আজকাল নানা কারণে সংকুচিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বনের মধ্যে তেলের জন্য অরণ্যবাসী জাতিবৃন্দকে কলুর উপরে নির্ভর করিতে হয় না। উড়িষ্যার উত্তরভাগে দেখিয়াছি মহুয়া রেড়ী করঞ্জ প্রভৃতি ফলের বীজকে প্রথমে ঢেঁকিতে কুটিয়া একটি ফুটন্ত জলভরা হাঁড়ির উপরে ঝুড়িতে রাখিয়া ভাপানো হয়। পরে ছোট ছোট টুকরির মধ্যে ভাপানো বীজচূর্ণকে ভরিয়া দুই খণ্ড মোটা কাঠ, অথবা একখণ্ড কাঠ ও একখণ্ড সমতল পাথরের মধ্যে রাখিয়া শুধু চাপের সাহায্যে তেল বাহির করা হয়। কিন্তু অরণ্যবাসী জাতিবৃন্দের মধ্যে তেলের ব্যবহারই কম। যতটুকু বা দরকার হয়, তাহাও তৈলনিষ্কাশন-বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ কলুর সাহায্য বিনা গৃহস্থেরা নিজের চেষ্টাতেই করিয়া লয়।

সকল জাতিরই লোহার প্রয়োজন হয়। উড়িষ্যায় চাপুয়া কমার নামে একজাতীয় কামার আছে। তাহারা গোরুর চামড়া দিয়া হাওয়া দিবার ভাঁটি তৈয়ারি করে এবং ব্রত অনুষ্ঠানে মদ্য ব্যবহার করে ও মোরগ বলি দেয় বলিয়া অপরাপর কামার অপেক্ষা নীচু বলিয়া গণ্য হয়। পালামৌ জেলায় ইহাদিগকে অসুর বলে এবং মধ্যপ্রদেশে এই জাতি আগারিয়া নামে পরিচিত। চাপুয়া কমারগণ পায়ে চাপ দেওয়া একপ্রকার ভাঁটির সাহায্যে তিন হাত উঁচু চুলির মধ্যে লোহার বীজপাথর গলাইয়া আজও লৌহ নিষ্কাশন করে। পাল লহড়ায় তৈয়ারি ঐরূপ লোহায় নির্মিত একটি কুড়ুল আমি মাত্র তিন আনা পয়সা দিয়া কিনিয়াছিলাম। চাপুয়া কমারেরা যে লোহা তৈয়ারি করে তাহার দ্বারা জুয়াঙ্গ, শবর, ভুইঞা প্রভৃতি জাতির প্রয়োজন মিটিয়া যায়।

মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মধ্যে আর বাকি থাকে দুই তিনটি; নুন, মাটির হাঁড়ি, কলসী এবং পরনের কাপড়। যখন জুয়াঙ্গ

পুরুষ এবং স্ত্রীলোক সকলেই হয়তো গাছের পাতা পরিত তখনকার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু বহুদিন হইতে তাহারা পাণ নামক একটি জাতির উপরে কাপড়ের জন্য নির্ভর করে। পাণেরা শবর বা জুয়াঙগ পল্লীর মধ্যে বাস করিয়া হাটে খরিদ করা সুতা দিয়া গামছা এবং কাপড় বোনে। হাঁড়িকুড়ি খরিদ করিবার জন্য জুয়াঙগগণকে নিকটবর্তী কোনো গ্রামের হাটে যাইতে হয়। লবণও তেমনই আমদানি করা জিনিস। উহা অবশ্য কোনো জাতিবিশেষ বিক্রয় করে না। একথা ঠিক যে ইংরেজি শাসনের পূর্বে উড়িষ্যার সমুদ্রকূলে নুনিয়া নামে এক জাতি লবণ নির্মাণ করিত এবং কুমাটি প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যবসায়ী জাতি গোরু বা ঘোড়ার পিঠে ছালায় ভরিয়া জঙগলের দেশে তাহা বেচিতে আসিত। কিন্তু এখন নুন পূর্বাপেক্ষা সস্তা হইয়াছে এবং যে কোনো হাটে কিনিতে পাওয়া যায়।

জুয়াঙগজাতি মাটির বাসন খুব সাবধানে ব্যবহার করে। যে কাজ বাঁশের চোঙগার দ্বারা সম্ভব, তাহা বাঁশের চোঙগা দিয়াই সারিয়া লয়। এমনকি খেজুর গাছের রস সংগ্রহ করিবার জন্য তাহারা মাটির পরিবর্তে বাঁশের পাত্র ব্যবহার করিয়া থাকে। রস পান করিবার জন্য তালপাতার ঠোঙগা বানাইয়া লয়।

শীতবস্ত্র বলিতে ইহাদের কিছু নাই, পরনের কাপড়ও অসম্ভব সংকীর্ণ। হাটের মধ্যে জুয়াঙগদের দেখিলেই প্রায় চেনা যায়। কারণ তাহাদের পরনে অপরের চেয়ে জীর্ণ এবং মলিন বস্ত্র থাকে। একবার শীতকালে আমি সিংভূম জেলায় এক বন্ধুর সহিত মোটরে সন্ধ্যাবেলা বনের পথে ফিরিতেছিলাম। সকালে সেই পথে যাইবার সময়ে কিছু দেখিতে পাই নাই। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা দেখিলাম সেখানে টাটকা ডাল-পালায় তৈয়ারি অন্তত দশ পনরখানি ঝুপড়ি ঘর তৈয়ারি হইয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে মুণ্ডাভাষাভাষী কয়েকজন লোক এখানে দিব্য একখানি গ্রাম বসাইয়া লইয়াছে। এই জাতিকে বির-হড় বলে। বির শব্দের অর্থ বন এবং হড় শব্দের অর্থ মানুষ। বির-হড় জাতি সিংভূম, হাজারিবাগ প্রভৃতি জেলার জঙগলে বাস করে এবং বনের খরগোশ তিতির বা অন্যান্য ছোটখাটো পশুপাখি শিকার করে। তদ্ভিন্ন অরণ্যজাত চোপ, শিয়াল অথবা মহুলান নামক কাণ্ডনজাতীয় লতার সাহায্যে মজবুত দড়ি অথবা

শিকা নির্মাণ করিয়া তাহারা বিভিন্ন হাটে বিক্রয়ের দ্বারা জীবিকানির্বাহ করে। বনের মালিক তাহাদের কাছে খাজনা আদায়ের চেষ্টা করিলেই তাহারা সেস্থান হইতে পলাইয়া কয়েক ক্রোশ দূরে নূতন ডেরায় সরিয়া যায়। যে বির-হড় বস্তিটির কথা উপরে উল্লেখ করিলাম, শীতের সন্ধ্যায় সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখি বির-হড়গণ পাতার ঝুপড়ির মধ্যে আগুন করিয়া তাহার চারিদিকে শুইয়া আছে। শীতে কষ্ট হয় কি না জিজ্ঞাসা করায় একজন বয়স্ক বিরহড় হাসিয়া উত্তর দিল,

সেঞেল দো আইঙ্গা লিজা
আগুনই তো আমাদের কাপড়।

জুয়াঙ্গ এবং অপরাপর জাতির মধ্যে সম্পর্ক

উপরের উদাহরণগুলি আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, উড়িষ্যা এবং ছোটনাগপুরের পাহাড়-জঙ্গলে সমাকীর্ণ অঞ্চলে এমন কতকগুলি জাতি বাস করে যাহাদের গ্রামে আমাদের মত ছুতার তাঁতি ডাক্তার বৈদ্য নাই, যাহারা কতকটা রবিনসন ক্রুশোর মত নিজেরাই ঘর বানায়, বনের ফলমূল আহরণ করে, শিকার করে, অসুখ হইলে বনজ ঔষধপত্রের সাহায্যে চিকিৎসা করিয়া থাকে, অনেক সময়ে তাহাও করে না। ইহাদের পল্লীতে শ্রমবিভাগ কম, শিল্পী বা বিশেষজ্ঞ নাই বলিলেই চলে। সর্ববিধ সাংসারিক প্রয়োজন স্থানীয় প্রচেষ্টার দ্বারাই যথাসাধ্য মিটাইয়া লয়। তবে অপরাপর জাতি হইতে ইহারা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন; সেকথা বলা চলে না। কারণ, সহযোগিতার পরিমাণ সাধারণ চাষীর গ্রামের তুলনায় কম হইলেও এখানেও পাণ, চাপুয়া কমার প্রভৃতি জাতির সহিত ইহারা অর্থনৈতিক সহযোগিতা অথবা অন্নের সূত্রে বাঁধা আছে। আবার মাঝে মাঝে হাটে গিয়া ইহারা অপর জাতির সহিত কেনাবেচার সম্পর্ক স্থাপিত করিয়া আসে। এইরূপে ব্রাহ্মণশাসিত সমাজ হইতে অপেক্ষাকৃত দূরে থাকিলেও ইহাদের পূজার মধ্যে লক্ষ্মীদেবী ঋষিপত্নী স্থান পাইয়াছেন; ধূনা জ্বালা হয়, আলোচালের ব্যবহার, স্নান উপবাস প্রভৃতি দেখা যায়। অথচ ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নাই।

এরূপ অবস্থায় প্রশ্ন হইল, জুয়াঙগ শবর প্রভৃতি জাতিকে হিন্দু-সমাজের অর্থাৎ বর্ণব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বিবেচনা করা যায় কি না।

পাল লহড়া রাজ্যের জনমত হইল, যদিও জুয়াঙগগণ অনার্য-ভাষাভাষী, যদিও তাহারা গোরু সাপ বরাহ বা অন্যান্য অমেধ্য জন্তুর মাংস খায়, তথাপি তাহাদিগকে হিন্দুজাতি বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে। কারণ, হিন্দুর মধ্যেও তো যাঁহারা বিলাতফেরৎ, তাঁহারা অমেধ্য মাংস ভক্ষণ করিয়াছেন। সকল হিন্দুর ভাষাও কিছু এক নহে। সকলে যে একই দেবতায় বিশ্বাস করে তাহাও নহে। অর্থাৎ, হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য বিভিন্ন জাতির মধ্যে দেশাচার বা লোকাচারে এত প্রভেদ আছে যে, জুয়াঙগ জাতিকে হিন্দুসমাজের অন্তর্গত একটি অনার্য জাতি বলিয়া গণ্য করিতে কোনো বাধা নাই। বিশেষত তাহাদের মধ্যে যখন ধীরে ধীরে লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবতার পূজা প্রবেশ করিতেছে, তাহারা স্নানাদির পর শুদ্ধাচারে পূজা করিতে শিখিয়াছে, তখন অল্পে অল্পে তাহাদের আচার আরও সংশোধিত হইয়া যাইবে এবং অপরাপর জাতির সহিত প্রভেদও কমিয়া আসিবে।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, জুয়াঙেগরা হাটে মাটির বাসন, কাপড়, লবণ প্রভৃতি খরিদ করিবার জন্য আসিয়া থাকে। তৎপরিবর্তে তাহারাও অরণ্য হইতে সংগ্রহ করা জ্বালানি কাঠ, অথবা বাঁশের চুপড়ি কুলা ডালা বুনিয়া আনে ও বিক্রয় করে। কেহ কেহ বর্ধিষ্ণু গৃহস্থের বাড়িতে মজুরিও করে। এইসম্পর্কে পাল লহড়া বা ঢেঙ্কানাল প্রভৃতি স্থানে একটি বিচিত্র ব্যাপার চোখে পড়ে। অরণ্যবাসী অনার্য জাতিগুলি যখন বনের বন্ধন, অর্থাৎ তাহাদের রবিনসন ক্রুশোর মত স্বয়ংসিদ্ধ ভাব, পরিহার করিয়া হাটে বা গ্রামে অপরাপর জাতির সহিত সহযোগিতার সূত্রে বাঁধা পড়ে তখন তাহারা প্রত্যেকে কোনো-না-কোনো বিশেষ বৃত্তিকে আশ্রয় করে এবং সম্ভব হইলে পুরুষানুক্রমে সেই বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা-নির্বাহের ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

ছোটনাগপুরের বির-হড় জাতির মত উড়িষ্যায় মাকড়খিয়া কুল্‌হ জাতি বনে সংগৃহীত লতার দ্বারা দড়ি অথবা শিকা নির্মাণ করিয়া হাটে হাটে বেচিয়া থাকে। ময়ূরভঞ্জের খাড়িয়াগণ বনজ ধুনা মোম মধু প্রভৃতি

সংগ্রহ করিয়া অল্প মূল্যে গ্রাম্য মহাজনের নিকট বেচিতে আসে। জুয়াঙ্গ জাতি ঢেঙ্কানাল শহরের নিকট অপরাপর গ্রামবাসীকে জ্বালানি কাঠ বিক্রয় করে, আবার পাল লহড়ার নিকট বাঁশের জিনিসপত্র বেচিয়া দু'পয়সা কামায়। প্রতি ক্ষেত্রেই দেখা যায়, প্রত্যেক জাতির কোনো-না-কোনো বিশেষ বৃত্তি আছে। স্থানীয় অবস্থা অনুসারে উড়িষ্যার একই অনার্য জাতি হয়তো বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু একবার একটি বৃত্তিতে কোনো জাতির একচেটিয়া অধিকার স্থাপিত হইলে অপরে আর সে বৃত্তিতে সহজে হাত দিতে চায় না। বিভিন্ন বৃত্তির মধ্যে ছোটবড় আছে: অতএব 'নীচু' জাতির বৃত্তি অনুসরণ করিয়া কেহ সহজে 'নীচু' হইতে চায় না।

পাল লহড়া, ঢেঙ্কানাল, ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি স্থানে ঘুরিয়া আমার আরও একটি বিষয় মনে হইয়াছে। আগেকার আমলে, অনার্য জাতির সহিত গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ্য বা আর্যসভ্যতার অন্তর্গত জাতিদের সম্পর্ক ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইত। এবং অনার্য জাতিবৃন্দের পরিবর্তন ধীরে ধীরে হইত বলিয়া তাহারা স্থানীয় প্রয়োজন অনুসারে এক বৃহত্তর অর্থনৈতিক পরিবারের মধ্যে শ্রমবিভাগের নিয়ম অনুসারে কোনো-একটি বিশেষ বৃত্তি অবলম্বন করিত। কেবল, আর্যসমাজের নিয়ম অনুসারে প্রতি জাতির কৌলিক বৃত্তিতে পুরুষানুক্রমে একাধিপত্য স্বীকৃত হইত। কিন্তু বর্তমান যুগে, অর্থাৎ রেলগাড়ি ও মোটরবাসের কল্যাণে অনার্য-জাতির স্বাতন্ত্র্য বা স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রাচীর যেন হুড়মুড় করিয়া ধ্বসিয়া পড়িতেছে। ধীরে-সুস্থে নয়, অতি দ্রুত প্রয়োজনে তাহারা বর্তমান অর্থনৈতিক সাগরে কে যে কোন্ তরণী অবলম্বন করিবে, কোন্ বন্দরে উঠিবে তাহার স্থিরতা নাই। অতএব ব্রাহ্মণ্যসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া কোনো বৃত্তিবিশেষে একচেটিয়া অধিকার রক্ষা করিয়া অপরের সহিত স্থির অন্নসূত্রের বন্ধনে সংযুক্ত হওয়া আর সম্ভব হইতেছে না। কিন্তু পূর্বে যখন অনার্য ও আর্য-সংস্কৃতির সংমিশ্রণ আরও ঢিমাতালে ধীরগতিতে ঘটিত, তখন সেরূপ বৃত্তিতে একাধিপত্য স্থাপন করা সম্ভব হইত এবং তাহাই আর্যসমাজের অভিপ্রায় ছিল, ইহা বলাই আমার উদ্দেশ্য।

মনুসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্র হইতে জানা যায় যে, অতি প্রাচীন-কাল হইতেই ভারতবর্ষীয় সমাজে প্রত্যেক জাতির জন্য বিশেষ বৃত্তি নির্দিষ্ট ছিল। বিভিন্ন জাতির গুণও ভিন্ন বলিয়া গণ্য হইত এবং কৌলিক গুণ ও কৌলিক বৃত্তির মধ্যে একটি অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপিত ছিল। স্বীয় কৌলিক বৃত্তির দ্বারা জীবিকা উপার্জন সম্ভব না হইলে, সমাজের অস্বাভাবিক অবস্থায়, অর্থাৎ আপৎকালে, অপরের বৃত্তি অনুসরণ করার রীতি প্রচলিত ছিল; কিন্তু তাহা আপদ্ধর্ম হিসাবে সাময়িক ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য হইত।

প্রতি জাতিকে স্ববৃত্তিতে নিয়োজিত রাখার দায়িত্ব দণ্ড বা রাজ-শক্তির উপরে ন্যস্ত ছিল। সমাজের হিতার্থে নানাবিধ বৃত্তির প্রয়োজন হইলেও কিন্তু সকল বৃত্তিধারী জাতির সামাজিক মর্যাদার মধ্যে তারতম্য ছিল। যে বৃত্তি সত্ত্বগুণপ্রধান, তাহার স্থান উচ্চে ছিল, যাহা রজোগুণ-প্রধান তাহার স্থান মধ্যে এবং অবশিষ্ট বৃত্তি নিম্নমর্যাদার অধিকারী ছিল।

অধিকাংশ অনার্য জাতি যেসকল বৃত্তি অনুসরণ করিয়া থাকে, তমোগুণের বাহুল্যবশত সেগুলি নিম্নপর্যায়ে পড়ে। অতএব অর্থ-নৈতিক বন্ধনে অপরের সহিত আবদ্ধ হইলেও অনার্য জাতিবৃন্দ সচরাচর অনাদর অবহেলায় কালাতিপাত করিত। ইহা সত্ত্বেও অনার্য জাতিবৃন্দ কেন বনের স্বয়ংসম্পূর্ণতা পরিহার করিয়া অপরের সহিত অন্নসূত্রের বন্ধনে আবদ্ধ হইবার চেষ্টা করিত? অথবা লক্ষ্মীদেবতা বা অপরাপর আর্য-দেবতা বা অনুষ্ঠানেরই বা অনুকরণ করিত কেন?

অনেকে মনে করেন, আর্যজাতিবৃন্দের নিকট যুদ্ধে পরাভব স্বীকার করিয়া কোল জুয়াঙ্গ প্রভৃতি জাতি দাসসুলভ মনোভাবের পরিচয় দিত। ইহা আংশিকভাবে সত্য হইতে পারে। কিন্তু 'দাসের' মনে স্বাধীনতার সকল আকাঙ্ক্ষা নিঃশেষে মুছিয়া গিয়া অপরের অনুকরণে উৎসাহ কেন জন্মে, তাহার অন্তর্নিহিত কারণ সম্বন্ধে কি আমাদের আরও অনুসন্ধানের প্রয়োজন নাই? আর্যজাতির অধিকার হইতে যখন দেশের শাসনভার চলিয়া গেল, দেশ যখন গণতান্ত্রিক ইসলাম বা খৃষ্ট-ধর্মাবলম্বী রাজশক্তির দ্বারা শাসিত হইতে লাগিল, তখনও যদি দেখা

যায়, অনার্য জাতিবৃন্দ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিরই অনুকরণ করিতেছে, ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজে উচ্চ-মর্যাদার অধিকারের জন্য লড়াই করিতেছে, তাহা হইলে শুধু দাসসুলভ অনুকরণপ্রিয়তার উপরে সকল দায়িত্ব চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায় না।

বিষয়টি বুঝিতে হইলে, আমরা বর্তমান অধ্যায়ে অরণ্যবাসী কয়েকটি জাতির মধ্যে ধীরে ধীরে স্বল্পপরিমাণ ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব বিস্তারের যে পরিচয় পাইয়াছি, তাহা অপেক্ষা বেশি প্রভাবান্বিত আরও কয়েকটি জাতির সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন। এইরূপে হিন্দু-সমাজের অন্তর্নিহিত অর্থনৈতিক সংগঠন এবং আর্য বা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিষয়ে, অর্থাৎ মোটামুটি হিন্দুধর্ম ও সভ্যতার বিষয়ে আরও গভীরভাবে আমাদের বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। তবেই হয়তো আমরা উপরোক্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর লাভ করিতে সমর্থ হইব।

নদীর কূলে, যেখানে জল আসিয়া তটভূমিকে সিক্ত করিতেছে, সেখান হইতে এবার অল্পে অল্পে মাঝদরিয়ায় পাড়ি দেওয়া যাক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুণ্ডা জাতির ইতিহাস

রাঁচি জেলার কোল অথবা মুণ্ডা জাতি কোনো সময়ে কেবলমাত্র ফলমূল আহরণ করিয়া অথবা বন্যজন্তু শিকারের দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিত কি না তাহা সঠিক বলা যায় না; কারণ যেসময় হইতে তাহাদের সম্বন্ধে আমরা সংবাদ পাইয়া থাকি, তখন হইতেই মুণ্ডাজাতি পার্বত্যভূমিতে লাঙলের সাহায্যে চাষ করিতেছে এবং স্থায়ী গ্রামের পত্তন করিয়াছে। চাষের বৃত্তি অবলম্বন করিলেও অপরাপর চাষী-জাতিবৃন্দের সহিত মুণ্ডাদের কয়েক বিষয়ে প্রভেদ দেখা যায়; ভূমি-স্বত্বের ব্যাপারে অথবা সামাজিক রীতিনীতির বিষয়ে তাহারা যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিত। উপরন্তু মুণ্ডাদের ভাষা আর্যগোষ্ঠীর অন্তর্গত নয়; কেবল বহু যুগের সম্পর্কের ফলে কোল-ভাষায় যথেষ্ট হিন্দী শব্দ ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে স্থান পাইয়াছে।

মুণ্ডা জাতির সামাজিক বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে বর্ণনা করিবার পর সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী ব্যাপিয়া তাহাদের জীবনের উপর দিয়া যে ঝড় বহিয়া গিয়াছে, সে বিষয়ে আলোচনা করা যাইবে। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে মুণ্ডা-সংস্কৃতির মধ্যে আধুনিককালে পরিবর্তনের কতকগুলি বিশেষ ধারা পরিলক্ষিত হয়। অতঃপর সেগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তন সম্বন্ধে হয়তো আমরা কিছু নূতন জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইব।

রাঁচি শহরের অধিবাসী স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র রায় ছোটনাগপুরের বিভিন্ন জাতিনিচয়ের প্রতি গভীর প্রেম ও সহানুভূতিবশত আজীবন গবেষণার ফলে যেসকল অমূল্য গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, এ বিষয়ে সেগুলিই আমাদের পথপ্রদর্শক হইবে।

মুণ্ডাদের সংস্কৃতি

এক সময়ে সমগ্র ছোটনাগপুর গভীর অরণ্যে আচ্ছাদিত ছিল। কোল অথবা মুণ্ডা জাতির পক্ষে পূর্বকালে কুঠার লইয়া দাহীর মত চাষ করা হয়তো বিচিত্র নয়। কারণ, এরূপ জারা (জ্বালানো)-র দ্বারা ক্রমে ক্রমে বনভূমি পরিষ্কার করার অস্পষ্ট স্মৃতি তাহাদের মধ্যে খুঁজিলে আজও পাওয়া যায়।

সমগ্র কোলসমাজ কতকগুলি কিলি বা গোত্রে বিভক্ত। বনভূমি পরিষ্কার করিবার পর কোনো পরিবারবিশেষ স্বীয় প্রয়োজন অনুসারে বনভূমির খানিক অংশ অধিকার করিত। অধিকৃত ভূমিখণ্ডের সীমা নির্দেশ করিবার জন্য এক বিশেষ রীতি প্রচলিত ছিল। বনের মধ্যে প্রয়োজন অনুসারে চারি জায়গায় আগুন জ্বালিয়া, সরলরেখার দ্বারা সেই চারি বিন্দুকে যোগ করিলে যে সীমা নির্দিষ্ট হইত, সেই ভূমি-খণ্ডের উপরে প্রথম খুঁটকাট্টিদারগণের সর্ববিধ স্বত্ব স্বীকৃত হইত। চারি সীমারেখার মধ্যে চাষের যোগ্য সকল জমি, অনাবাদী জমি এবং বনভূমি সবই তাহাদের; এমনকি মাটির নীচে খনিজ পদার্থ বাহির হইলে খুঁটকাট্টিদার ভিন্ন অপর কাহারও তাহাতে স্বত্ব জন্মিত না। এইরূপে সমগ্র মালিকানা স্বত্ব স্বীয় আয়ত্তে থাকার ফলে খুঁটকাট্টিদারগণ কাহারও নিকটে জমির জন্য খাজনা দিত না।

যে কুল গ্রামের পত্তন করিত সকলে সেই কুলের জ্যেষ্ঠ ব্যক্তির শাসন মানিয়া লইত। সেই ব্যক্তিকে মুণ্ডা, অর্থাৎ শীর্ষস্থানীয়, এই পদবীতে ভূষিত করা হইত। বস্তুত, কোলজাতির মুণ্ডা নাম ঐ শব্দ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। গ্রামের মুণ্ডাকে সকলে সামাজিক শাসনের ব্যাপারে মানিয়া চলিলেও ভূমিস্বত্বের ব্যাপারে মুণ্ডার কোনো বিশেষ অধিকার জন্মিত না। কারণ, ভূমির মালিকানা স্বত্ব আসলে সমবেতভাবে সমগ্র খুঁটকাট্টিদারগণের উপরে ন্যস্ত থাকিত। প্রতি ব্যক্তির ব্যবহারের জন্য খুঁটকাট্টিদারগণের মণ্ডলী জমি নির্ধারণ করিয়া দিতেন; সেই জমিতে উৎপন্ন ফসলের উপর চাষীর ব্যক্তিগত অধিকার স্বীকৃত হইত। প্রয়োজন হইলে পঞ্চায়েৎ কখনও কখনও জমিবিলির সম্বন্ধে নূতন বন্দোবস্ত করিতে পারিতেন।

গ্রামের চতুঃসীমার মধ্যে মুণ্ডা জাতি আজও সযত্নে একটি বস্তু রক্ষা করিয়া চলে। প্রয়োজন যতই গুরুতর হউক না কেন, গ্রামবাসিগণ আদিম অরণ্যের কয়েকটি পুরাতন বৃক্ষের উপরে কিছুতেই হস্তক্ষেপ করে না। এই বৃক্ষসমষ্টিকে সারনা নামে অভিহিত করা হয়। সারনাতে গ্রামের দেবতা অধিষ্ঠান করেন এবং সেখানে তাঁহার উদ্দেশ্যে পূজা এবং বলিদান হইয়া থাকে।

মুণ্ডা জাতির মধ্যে কাহারও মৃত্যু ঘটিলে শব দাহ করাই রীতি; কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে সমাধিও দেওয়া হইয়া থাকে। দাহই হউক অথবা সমাধিই হউক, পরে অস্থিগুলি সংগ্রহ করিয়া মাটির পাত্রে ভরিয়া সেগুলিকে গ্রামের অন্তর্গত সসানে পুতিয়া দিবার রীতি আছে। এক সসানে মাত্র একটি কিল্লির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণের অস্থি প্রোথিত হয়। অস্থি-সমাধির উপরে বড় বড় চওড়া পাথর খাড়াভাবে অথবা মাটির উপরে শোওয়াইয়া রাখা হয়। সম্মানিত ব্যক্তির জন্য যথাসম্ভব বড় আকারের পাথর দেওয়া হইয়া থাকে। এই সকল পাথর সসান-দিরি অর্থাৎ শ্মশানের পাথর নামে পরিচিত। প্রাচীন মুণ্ডাগ্রামমাত্রের ইহা একটি বিশেষ লক্ষণ। গ্রামের কোনও অধিবাসী দূর দেশে মারা গেলে আত্মীয়স্বজন তাহার অস্থি সংগ্রহ করিয়া স্বীয় কিল্লির সসানে তাহা স্থাপিত করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করে। যেসকল গ্রামে আজকাল মুণ্ডাজাতি বাস করে না, সেখানে পুরাতন সসান-দিরি দেখিলে আমরা অনুমান করিতে পারি, এক সময়ে সেখানে মুণ্ডাদের বসবাস ছিল।

প্রত্যেক মুণ্ডা-গ্রামে সারনা এবং সসান ব্যতীত আরও একটি বিশেষ লক্ষণ দেখা যায়। উৎসবের দিনে অথবা সারাদিবস পরিশ্রমের পর ইচ্ছা হইলে গ্রামের স্ত্রীপুরুষ একখণ্ড পরিষ্কৃত জমিতে মাদল বাজাইয়া নাচগান করে; ঐ স্থানটিকে আখড়া বলে। প্রতি গ্রাম যেমন একজন মুণ্ডার অধীন, দশ-পনরখানি গ্রামও তেমনই একজন মানকির অধীন থাকে। পূর্বে মুণ্ডাসমাজে মানকির প্রতিপত্তি এবং কর্তব্যও যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আজকাল সামান্য সামাজিক বিচার ভিন্ন স্বীয় এলাকার অন্তর্গত আখড়াগুলির নেতৃত্ব করা ছাড়া তাহার আর বিশেষ কোন কর্তব্য নাই। এক মানকির অধীন এলাকাকে পট্টি, পাড়া বা পিড় বলা

হয়। যাত্রার সময়ে যখন বিভিন্ন পাড়ার আখড়াগুলি সমবেত হয়, তখন প্রতি পাড়ার এক একটি পতাকা শোভাযাত্রাসহকারে লইয়া যাওয়া হয়। কোনও পতাকায় ব্যবহৃত চিহ্ন অপরে ব্যবহার করিলে পাড়ায় পাড়ায় দাঙ্গা বাধে এবং সময়ে সময়ে দুই চারিজন খুন-জখমও হইয়া যায়।

সারনা, সসান এবং আখড়ার সহিত মুণ্ডাগ্রামে আরও একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান দেখা যায়। গ্রামের অবিবাহিত যুবকগণ রাত্রে বাড়িতে শোয় না। তাহারা একত্র হইয়া যে ঘরে রাত্রিযাপন করে সে ঘরটিকে গিতি-ওড়া বা শুইবার ঘর বলা হয়। কুমারীদের জন্যও তেমনই কোনও বর্ষীয়সী বিধবার বাড়িতে অতিরিক্ত ঘর থাকিলে আর একটি গিতি-ওড়া প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। গিতি-ওড়াতে গ্রামের যুবকেরা শুধু একত্র শোয় না, পরস্পরের সহিত নুতুম কা-আনি বা ধাঁধাঁর আলোচনা করিয়া বুদ্ধির খেলাও খেলে। তদ্ভিন্ন বয়স্ক গ্রামবাসীদের নিকট যুবকেরা কাজি কা-আনি বা পুরাণের গল্প শুনিয়া প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করে।

একদিকে সারনা, সসান, আখড়া এবং গিতি-ওড়া, অপরদিকে ভূমির মালিকানা-স্বত্ব খুঁটকাট্টিদারগণের পঞ্চায়েতের উপরে ন্যস্ত করিয়া, মুণ্ডা এবং মানকিদের শাসনে মুণ্ডাজাতির জীবনযাত্রা এক রকম সুখে-দুঃখে কাটিয়া যাইতেছিল। যতদিন অনাবাদী বনভূমির অভাব ঘটে নাই, ততদিন কোন গ্রামে বাসিন্দার সংখ্যা বেশি বাড়িয়া গেলে নূতন বনে নূতন খুঁটকাট্টি গ্রামের পত্তন করা সম্ভব হইত। সে সময়ে মুণ্ডাগণ লোহার জন্য কোলভাষাভাষী অসুর বা আগারিয়া জাতির উপরে নির্ভর করিত: তেলের জন্য দুই খণ্ড বৃহৎ কাঠের পাটায় চাপ দিত; কাপড়ের জন্য উড়িষ্যার পাণ জাতির মত পাঁড় বা পেঁড়াই নামক এক জাতির শরণাপন্ন হইত। ছুতারের কাজ অবশ্য মুণ্ডা গৃহস্থ নিজেরাই সারিয়া লইত। অন্য দু-একটি প্রয়োজনের জন্য নিকটবর্তী হাটেবাজারে জুয়াঙ্গ বা ভুইঞাদের মত যাতায়াত করিত।

কিন্তু কালক্রমে হাজারিবাগ এবং পালামৌ জেলায় বিবিধ চাষী জাতিবৃন্দের জমির অকুলান হওয়ার ফলে রাঁচি জেলার উপরে আগন্তুকদের চাপের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ব্রাহ্মণশাসিত সমাজে

শ্রমবিভাগের দ্বারা জীবনের মান যেভাবে উন্নত করা সম্ভব হয় তাহা দেখিয়া মুণ্ডাজাতিও কিছু কিছু শিল্পের অনুকরণ করিতে লাগিল। মুণ্ডারা কাপাস বুনিয়া চরকার সাহায্যে তাহা কাটিতে শিখিল; তেলের পাটা ছাড়িয়া কলুর মত ঘানি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু হিন্দুসমাজে কলুর স্থান নীচু বলিয়া গণ্য হওয়ায়, জাত হারাইবার ভয়ে, ঘানিতে বলদ না যুতিয়া মুণ্ডা গৃহিণীগণ স্বয়ং ঘানি ঠেলিয়া তেল পিষিতে লাগিল।

অর্থাৎ, হিন্দুসমাজে বিভিন্ন জাতির নিবিড় সহযোগিতার দ্বারা যে উৎপাদনব্যবস্থা রচিত হইয়াছিল, মুণ্ডা জাতি মোটামুটি তাহা স্বীকার করিয়া লইল এবং সেই সমাজে বিভিন্ন জাতির মধ্যে যেমন তারতম্য পরিলক্ষিত হয়, মুণ্ডাসমাজেও তেমনই ছোটবড়র ভেদাভেদ স্থাপিত হইল। যেসকল পরিবার শুধু কামারের কাজ অথবা কাপড় বোনা অথবা গোরুবাছুর চরানোর ব্যাপারে নিযুক্ত থাকিত, খুঁটকাট্টিদারগণ তাহাদিগকে নিজেদের সমান বলিয়া কিছুতেই বিবেচনা করিত না। চাষী মুণ্ডারা নিজেদের সাধারণ চাষী জাতির সমপর্যায় মনে করিয়া অপর অনেকগুলি বৃত্তিধারী কারিগরশ্রেণীকে আরও নীচু বলিয়া গণ্য করিত।

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণশাসিত সমাজের উৎপাদনব্যবস্থার সহিত সেই সমাজে প্রচলিত ছোটবড়র ভেদাভেদও কোলভাষাভাষী জাতিবৃন্দের মধ্যে সংক্রামিত হওয়ার ফলে, তাহারা কার্যত হিন্দুসমাজের অন্তর্গত একটি জাতিতে পরিণত হইল।

রাজার অভ্যুদয় এবং মুসলমানী আমল

ঠিক কোন্ সময়ে জানা নাই, তবে যথেষ্ট প্রাচীনকালে, মুণ্ডাগণের উপরে যেমন মানকি ছিলেন, মানকিদের উপরেও তেমনই একজন রাজা দেখা দিলেন। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে, ছোটনাগপুরের নাগবংশী রাজপরিবার সম্ভবত কোনও অনার্য জাতি হইতে উদ্ভূত হইয়া কালক্রমে পাচেট, সিংভূম প্রভৃতি অঞ্চলের রাজবংশের সহিত বৈবাহিক-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া অবশেষে ক্ষত্রিয়ত্বের মর্যাদা লাভ করেন। ইহা সত্য হইতে পারে, অথবা নাও হইতে পারে।

সম্রাট আকবরের সময়ে ছোটনাগপুর সর্বপ্রথম আক্রান্ত হয়। পালামৌ জেলায় হীরার খনি আছে শুনিয়া বোধ হয় বাদশাহ সৈন্য প্রেরণ করিয়া উহাকে করদ রাজ্যে পরিণত করিলেন। জহাংগীরের আমলে রাজা দুর্জনসালের রাজত্বকালে কিন্তু পুনরায় মোগল সৈন্য ছোটনাগপুর আক্রমণ করে এবং দুর্জনসালকে গ্রেপ্তার করিয়া গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী অবস্থায় রাখা হয়। অবশেষে কোন কারণবশত মোগল সম্রাটের কৃপালাভে সমর্থ হইয়া দুর্জনসাল মুক্তিলাভ করেন ও স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। সে সময়ে মোগল সম্রাট তাঁহাকে সাহ বা সাহি পদবীতে ভূষিত করিলেন এবং ছোটনাগপুরের মালগুজারি বাৎসরিক ৬০০০, টাকা ধার্য করিয়া দিলেন।

বন্দী হওয়ার পূর্বে মহারাজা দুর্জনসাল সামান্যভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেন; তখন তাঁহার রাজধানী খুকরা নামক এক পল্লীতে অবস্থিত ছিল। বড় বাড়ি-ঘর-দুয়ার কিছু ছিল না, কিন্তু প্রবাদ আছে যে সেখানে গ্রামের শোভার মধ্যে বাহান্নটি বাগান ও তিপ্পান্নটি পুকুর বর্তমান ছিল। কিন্তু দিল্লী রাজধানী হইতে ফিরিবার পর দুর্জনসাল নিজের রাজ্যে শহরের শোভা আনিবার জন্য লালায়িত হইলেন। বর্তমান রাঁচি শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে তিনি দোইসানগরে বিরাট এক রাজধানী ফাঁদিয়া বসিলেন। সেখানে ক্রমে গড়খাইযুক্ত পাঁচতলা নওরতন রাজপ্রাসাদ নির্মিত হইল এবং সংগে সংগে কতকগুলি দেবালয়ও গঠিত হইল। হরিনাথ নামে রাজার গুরুদেব ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে দোইসাতে জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ করান। কপিলনাথের মন্দির ১৭১১ খৃষ্টাব্দে গঠিত হয়। কিন্তু মন্দির গড়ার ব্যাপার শুধু রাজধানীতে আবদ্ধ থাকে না। রাঁচি শহরের অন্তর্গত চুটিয়া নামক পল্লীতে যে পুরানো মন্দির আছে তাহা ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়। রাজা দুর্জনসালের পৌত্র রাজা রঘুনাথ সাহির রাজত্বকালে ১৬৯১ খৃষ্টাব্দে ঠাকুর অয়নি সাহি রাঁচির নিকটে জগন্নাথপুরের মন্দিরটি নির্মাণ করান। রাঁচির পাঁচ মাইল উত্তরে বোড়েয়া গ্রামে যে মন্দির আছে তাহাও রঘুনাথ সাহির রাজত্বকালে নির্মিত হয়। লছমিনারায়ণ তেওয়ারি উহা ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ করিয়া ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে শেষ করেন।

মন্দিরের শিল্পীর নাম ছিল অনিরুদ্ধ। তিনি কোন্ দেশের লোক ছিলেন বলা যায় না। মন্দিরের গড়নে উড়িষ্যার প্রভাব বর্তমান না থাকিলেও কপাটের উপরে যে নবগুঞ্জর মূর্তি ও গজসিংহ মূর্তির অপভ্রংশ খোদিত আছে, তাহা হইতে অনুমান হয়, শিল্পী উড়িষ্যার লোক ছিলেন না বটে, কিন্তু উড়িষ্যার মূর্তিশিল্পের সহিত তাঁহার সামান্য পরিচয় ছিল।

উপরোক্ত মন্দির এবং তাহার নির্মাণকাল সম্বন্ধে আলোচনা করিবার হেতু এই যে, ইতিপূর্বে ছোটনাগপুর রাজবংশে ঐশ্বর্যের যেমন বিশেষ কোনও পরিচয় পাওয়া যায় নাই, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে তাহার পরিবর্তে দেশের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়। রাজসভায় বিহার এবং সম্বলপুর হইতে আগত সভাসদ্‌বর্গের কিছু কিছু পরিচয় এই সময় হইতে পাওয়া যায়। ছোটনাগপুররাজ ঐশ্বর্য-বিস্তারের চেষ্টায় স্বীয় সভাকে রাউতিয়া, ভাইয়া, বৃত্তিয়া, পাণ্ডেয়, জমাদার, ওহদার প্রভৃতি পদবীধারী ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ পার্শ্বচরের দ্বারা সুশোভিত করিতে লাগিলেন এবং উল্লিখিত সভ্য আগন্তুকদের ভরণপোষণের জন্য তিনি জায়গিরপ্রথা প্রচলিত করিয়া দেশে এক নূতন আর্থিক বন্দোবস্ত আরম্ভ করিলেন। রাজসরকারের দপ্তরে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন যে দলিল পাওয়া যায় তাহার তারিখ হইল খৃষ্টীয় ১৬৭৬ সাল।

যেসকল ব্যক্তিকে বিভিন্ন খূঁটকাট্টি গ্রামের উপরে জায়গিরদার অথবা এলাকাদার নিযুক্ত করা হইল, তাঁহাদের নিকট ছোটনাগপুরের প্রচলিত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। পূর্বে খূঁটকাট্টিদারগণের নিকট রাজা সামান্য উপঢৌকন লাভ করিতেন, অথবা প্রজা রাজবাড়িতে দু-চার দিন বেগার খাটিয়া যাইত; অর্থাৎ মজুরির উপঢৌকন দিত। কিন্তু জায়গিরদারগণ খূঁটকাট্টি গ্রামের উপরে তাঁহাদের মালিকানা-স্বত্ব জন্মিয়াছে বিবেচনা করিয়া প্রজার নিকট নগদ খাজনা আদায় করিতে লাগিলেন। ফলে মুণ্ডাজাতির জমির উপরে একাধিপত্য সংকীর্ণ হইয়া গেল এবং তাহাদের আর্থিক অবস্থাও ক্রমশ সঙ্গীন হইতে লাগিল।

এমনই এক সময়ে খূঁটির নিকটবর্তী হেসাগ্রামের অধিবাসী গাসি মুণ্ডা নামে জনৈক ব্যক্তি রাঁচি জেলার পশ্চিমাংশে গভীর অরণ্যের

বোড়েয়ার মন্দিরে নবগুঞ্জর মূর্তি

বোড়েয়ার মন্দিরে গজসিংহ মূর্তি

মধ্যে সরিয়া গিয়া পুনরায় পুরাতন খুঁটকাট্টি প্রথা অনুসারে নূতন এক গ্রামের পত্তন করে। অর্থাৎ সে ব্যক্তি পিছু হটিয়া পুরাতন উৎপাদন-ব্যবস্থাকে অবলম্বন করিয়া বাঁচিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সকলের পক্ষে এরূপ ব্যবস্থা সম্ভব হয় নাই; কারণ, নূতন বসতি করিবার মত অরণ্যের বা অনাবাদী জমির তখন অনটন ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং পুরাতন গ্রামগুলিতে জায়গির-প্রথা প্রবর্তনের ফলে মুণ্ডাদের ভূমিস্বত্ব উত্তরোত্তর পরিবর্তিত এবং সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে।

যে জায়গিরদারগণ রাজপ্রসাদের লোভে আকৃষ্ট হইয়া ছোটনাগপুরের বাহির হইতে আগমন করিলেন, তাঁহারা একা আসেন নাই। তাঁহাদের সঙ্গে আহির কুমার নাপিত এবং কয়েকটি অবনত জাতিও ছোটনাগপুরে প্রবেশলাভ করে। মোগল বাদশাহের আমল হইতে কিছু মুসলমান সৈনিক স্থায়িভাবে ছোটনাগপুরে বসবাস করিতেছিল, এবারে তেমনই জায়গিরদারগণের সহিত কিছু জোলা জাতীয় তাঁতি এখানে বসবাস করিতে আরম্ভ করিল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমল

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে শাহ আলম ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে বাঙলা, বিহার এবং উড়িষ্যার দেওয়ানি অর্পণ করেন। ছোটনাগপুরের দেওয়ানি বিহারের অন্তর্ভুক্ত থাকায় উহার সহিত কোম্পানির সম্পর্ক ঐ সময় হইতে আরম্ভ হয়। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন ক্যামাক নামে এক ব্যক্তি প্রথম সৈন্যসমভিব্যাহারে ছোটনাগপুরের অন্তর্গত পালামৌ রাজ্যে উপস্থিত হন। সে সময়ে ইংরেজের সহিত মহারাট্টাশক্তির সংঘর্ষ চলিতেছিল। মহারাট্টাগণের পথে কিছু বাধা সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে এবং সঙ্গে সঙ্গে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে গমন করিবার নূতন একটি পথ লাভ করিবার আশায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ছোটনাগপুরের তদানীন্তন রাজা দর্পনাথ সাহির সহিত নূতন এক চুক্তির সূত্রে আবদ্ধ হন। ততদিন পর্যন্ত ছোটনাগপুরের মালগুজারি বাৎসরিক ৬০০০৲ টাকা ধার্য ছিল। কিন্তু খাস ব্রিটিশ শক্তির সহিত বন্ধুত্বলাভের মূল্যস্বরূপ রাজা দর্পনাথ

সাহি কোম্পানিরই প্রস্তাবানুযায়ী মালগুজারি ভিন্ন অতিরিক্ত আরও ৬০০০৲ টাকা নজরানাস্বরূপ দিতে স্বীকৃত হইলেন। পাটনা শহরে অবস্থিত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাউন্সিল রাজা দর্পনাথের আচরণে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শনের জন্য এক মূল্যবান খেলাৎ উপহার দিলেন। কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ রাজা দর্পনাথ ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে রামগড় রাজ্য জয়ের ব্যাপারে কোম্পানিকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

কোম্পানির আমলে প্রথমে ছোটনাগপুরের নিকট যে প্রাপ্য নির্ধারিত হয় শীঘ্রই তাহা বর্ধিত হইয়া ১৪১০০।/৩ পাই এবং পরে ১৫০৪১৲ টাকায় পরিণত হয়। দর্পনাথ করদ রাজার মর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু তাঁহার মত অরণ্যবহুল অঞ্চলের রাজার পক্ষে, যেখানে চাষেরও বিশেষ কোনও উন্নতিলাভ হয় নাই, সেখানে অত বেশি খাজনা দেওয়া উত্তরোত্তর কঠিন হইতে লাগিল। ছোটনাগপুরের মালগুজারি কেবলই বাকি পড়িতে লাগিল। ইতিমধ্যে প্রজাগণও রাজার বর্ধিত কর-ভার বহন করিতে না পারিয়া ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে তামাড় নামক পরগণায় বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। যদিও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সৈন্য পাঠাইয়া বিদ্রোহ দমন করিলেন, তবু ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তাহার বহ্নি ধূমায়িত হইতে লাগিল। ১৭৯৭ সালে বিষ্ণু মানকির নেতৃত্বে সেখানে পুনরায় হাঙ্গামা বাধে। তামাড় পরগণা ভিন্ন রাহে এবং সিল্লি পরগণাতেও ১৭৯৬-৯৮ খৃষ্টাব্দে অনুরূপ কারণে অসন্তোষের আগুন জ্বলিয়া উঠে।

১৮০০ খৃষ্টাব্দের পর কোম্পানি ছোটনাগপুরে স্ট্যাম্প এবং আবগারি আইন জারি করিলেন। প্রজার করভার এবং অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইবার আরও নূতন কারণ ঘটিল। ইতিমধ্যে রাজা সময়মত মালগুজারি আদায় করিতে পারিতেছেন না বলিয়া ১৮০৬ সালে কোম্পানি রাজাকে শান্তিরক্ষার নিমিত্ত থানাদার এবং চৌকিদার নিয়োগ করিতে বাধ্য করিলেন। প্রজার মাথার উপরে খরচের ভার এইরূপে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পূর্বকালে, জায়গিরপ্রথা প্রবর্তনের সময়ে, গাসি মুণ্ডা যেমন পলাইয়া বাঁচিবার চেষ্টা করিয়াছিল, নূতন রাষ্ট্রশাসনের প্রসার-

কালে কিন্তু সেরূপ পলায়নের আর সম্ভাবনা রহিল না। অথচ রাষ্ট্র-সংগঠনের ফলে প্রজার আয়বৃদ্ধির কোনো সম্ভাবনা তখনও দেখা যায় নাই। ফলে বারংবার নানাস্থানে প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে লাগিল। ১৮১২ সালে একবার হাঙ্গামা হয়; তাহার পর ১৮১৯-২০ সালে রুদু এবং কোণ্টা মুণ্ডার নেতৃত্বে পুনরায় বিদ্রোহ ঘোষিত হয়। দুঃখের বিষয়, এই দুই ব্যক্তিকে শেষ পর্যন্ত কোম্পানির জেলের মধ্যে দেহরক্ষা করিতে হয়।

এই সকল ঘটনার সুযোগ লইয়া ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ছোট-নাগপুরের মহারাজাকে করদ রাজার মর্যাদা হইতে বিচ্যুত করিয়া ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে স্বীয় তত্ত্বাবধানে কর্মচারীর দ্বারা ছোটনাগপুরের শাসনভার পরিচালনা করিলেন। খুঁটকাট্টিদারগণ এতদিন রাজা এবং আগন্তুক জায়গিরদারগণের অধীনে যেভাবে শাসিত হইতেছিল, এবার তাহার পরিবর্তে সরাসরি আধুনিককালের রাষ্ট্রীয় শাসনের অধীন হইয়া গেল।

এক নূতন উৎপাত

পুরাতনের বন্ধন কিন্তু তাহার দ্বারা সম্পূর্ণ শিথিল হয় নাই। পুরাতন আপন শিকড় আরও বিস্তার করিয়া মাটিকে বিদীর্ণ করিতে লাগিল; ইতিমধ্যে পুরাতন বৃক্ষটিকে প্রায় শ্বাসরুদ্ধ করিয়া নূতন রাষ্ট্রীয়শাসনরূপ যে পরগাছাটি বৃদ্ধি পাইতেছিল, তাহাও মাটি হইতে অতিরিক্ত রস সংগ্রহ করিয়া চলিল।

জায়গিরদার প্রথা প্রবর্তনের সময়ে যেমন দেশে এক উৎপাতের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, এবারে তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া দেশে ঠিকাদার নামে এক নূতন শ্রেণীর শোষকের উদয় হইল।

১৮২২ খৃষ্টাব্দে রাজা গোবিন্দনাথ সাহিদেও স্বর্গারোহণ করিলে জগরনাথ সাহিদেও নামে ঊনবিংশবর্ষীয় অপরিণতবয়স্ক এক যুবক সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কিছু শিখ এবং অন্যান্য হিন্দু ব্যবসাদার ও সমধিক সংখ্যায় মুসলমান ব্যবসাদার সেই সময়ে মক্ষিকার মত রাজসভার চতুষ্পার্শ্বে আসিয়া জড় হয়। ইহারা বাহিরের সম্পদস্বরূপ

অশ্ব, শাল-আলোয়ান এবং মূল্যবান রেশমী কাপড় লইয়া রাজার নিকট বিক্রয় করিতে আসে। ঐশ্বর্যের প্রতি এবং ভোগের প্রতি রাজার আকর্ষণ ছিল, দুর্জনসালের আমল হইতেই তাহার সূচনা দেখা গিয়াছিল। কিন্তু বর্তমান রাজার পক্ষে নগদ মূল্য দিবার ক্ষমতা ছিল না বলিয়া তিনি ঠিকাদারগণকে একে একে জমিদারি সম্পত্তি লিখিয়া দিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের পরিবর্তে বৈশ্যেরা এবার ভূসম্পত্তির মালিক হইয়া বসিতে লাগিল।

এইসকল ঠিকাদার মুণ্ডা প্রজার নিকটে শুধু খাজনা আদায় করিয়া ক্ষান্ত হইত না। সেলামি এবং আবোয়াবের আর অন্ত ছিল না। পূর্ববর্তী জায়গিরদারগণ শোষণ করিলেও অন্তত প্রজাবৃন্দের মধ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেন বলিয়া উভয়ের মধ্যে ব্যক্তিসম্বন্ধ স্থাপনার ফলে যেভাবে পরস্পরের সম্পর্ক কিছু মসৃণ হইয়াছিল, নূতন অর্থ-লোভী ঠিকাদারগণের সহিত কিন্তু অনুরূপ কোনও সম্পর্ক গড়িয়া উঠা সম্ভব হইল না।

পূর্বে মুণ্ডা প্রজা বছর বছর গ্রামের মাতব্বরকে যেসকল জিনিস উপহার দিত, অথবা নেতৃস্থানীয় বলিয়া তাহার বাড়িতে যে কয়দিন খাটিয়া মজুরির ভেট দিত, ঠিকাদারগণ সেইসকল বস্তু এবং মজুরিকে নিজেদের ন্যায্য পাওনা বলিয়া গণ্য করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ যাহা নেতৃত্বের মূল্য ছিল, ভূমি সম্পর্কে নূতন বন্দোবস্তের ফলে তাহা ভূমি ব্যবহারের মূল্য বা খাজনা হিসাবে রূপান্তরিত হইল। সেইজন্য 'ঠিকাদার' নাম শুনিলেই মুণ্ডাজাতি ঘৃণা এবং ক্রোধে শিহরিয়া উঠিত। পরবর্তীকালে সংকলিত বাঙলা গভর্মেণ্টের এক প্রস্তাব পাঠ করিলে আমরা জানিতে পারি যে, মুণ্ডাগণ পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করিত, 'পাঠানেরা আমাদের ইজ্জৎ নষ্ট করিয়াছে; শিখ আমাদের বোনেদের লুটিয়া লইয়াছে। আমরা সকলে এক জাতির লোক, অতএব এক হইয়া লুঠতরাজ করিব, খুনজখম আরম্ভ করিব'।

এইরূপ শোষণ এবং অত্যাচারের ফলে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ছোটনাগপুরে পুনরায় বিদ্রোহের দাবানল প্রচণ্ডভাবে জ্বলিয়া উঠিল।

খৃষ্টান ধর্মযাজকগণের আগমন ও পরবর্তী কালের ইতিহাস

ইতিমধ্যে ছোটনাগপুরের অধিবাসিগণের জীবনে এক বড়রকমের পরিবর্তনের সূচনা দেখা দেয়। মুণ্ডা-চাষীদের ভূমির উপর অধিকার যখন নানাদিক দিয়া সংকুচিত হইয়া আসিতেছে, ইংরেজ সরকার যখন প্রকৃত ব্যথা কোথায় তাহা না বুঝিয়া জমিদারশ্রেণীকেই সাহায্য করিয়া চলিয়াছেন, তখন ইউরোপ হইতে আগত জার্মান ও ইংরেজ প্রটেস্টাণ্ট এবং পরে রোম্যান ক্যাথলিক ধর্মযাজকগণ অকুণ্ঠিতচিত্তে মুণ্ডা জাতির সহায় হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহারা কেবলমাত্র সরকারের নিকট মুণ্ডা জাতির ন্যায্য অধিকার সম্পর্কে দাবী জানাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, দুর্দিনের সময়ে অনাহারক্লিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে অন্ন বিতরণ করিয়াই নিরস্ত হন নাই, উপরন্তু মুণ্ডা উরাঁও প্রভৃতি জাতির ভাষা শিখিয়া, ঐসকল জাতিকে কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিবার জন্য, উন্নত জীবনযাত্রার পদ্ধতি শিখাইবার জন্য অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টান ধর্মযাজকগণের নিকট ছোটনাগপুরের অরণ্যবাসী জাতিসমূহ বোধ হয় সর্বপ্রথম মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ মর্যাদা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

পূর্বোক্ত ১৮৩২ সালের বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে পর সোনপুর এবং বাসিয়া পরগণায় পুনরায় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে হাঙ্গামা আরম্ভ হয়। ১৮৫৭ সালে সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে ছোটনাগপুরের সৈন্যাবাসে বিদ্রোহ ঘটিলেও সাধারণ প্রজা তাহাতে যোগ দেয় নাই। সিপাহী যুদ্ধের পর ১৮৫৮ সালে গভর্মেণ্ট ছোটনাগপুরের ভূমিস্বত্ব সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য তৎপর হইলেন। মুণ্ডাদের মধ্যে তখনও যেসকল প্রাচীন স্বত্ব অবশিষ্ট ছিল, সেগুলিকে সংরক্ষণ করিবার জন্য ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ভূঁইহারি আইন নামে এক আইন পাশ করা হইল।

কিন্তু ভূঁইহারি আইন প্রবর্তনের ফলে মুণ্ডাদের যে পরিমাণ সুবিধা হওয়া উচিত ছিল, কার্যত তাহা ঘটে নাই। ইহার প্রথম কারণ হইল, আইনপ্রণয়নের পূর্বেই মুণ্ডাদের জমির উপরে প্রাচীন অধিকার অনেকাংশে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। দ্বিতীয়ত, আইনপ্রণয়নের সময়ে, বন হইতে গৃহনির্মাণ অথবা জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করিবার যে অবাধ

অধিকার তাহারা এতদিন ভোগ করিয়া আসিতেছিল, সে অধিকার রক্ষা করা হইল না। তদুপরি, সারনা নামক ভূমিখণ্ডের উপরে গ্রামের সমবেত অধিকার ভুঁইহারি আইনের বহির্ভূত হইয়া রহিল। তৃতীয়ত, অশিক্ষার কারণে তাহারা নানাভাবে বঞ্চিত হইতে লাগিল। এতদিন পর্যন্ত ইংরেজ গভর্মেণ্ট ছোটনাগপুরে যে নীতি অবলম্বন করিয়া আসিতেছিলেন, তাহার ফলে মুণ্ডাগণের পক্ষে গভর্মেণ্টকে মিত্র বা বন্ধু হিসাবে দেখিবার কোনো কারণ ঘটে নাই। ভুঁইহারি আইন তাহাদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে তাহাদের সময় লাগিল। ইতিমধ্যে স্থানীয় জায়গিরদার এবং ঠিকাদারগণ যখন তাহাদিগকে বুঝাইতে লাগিল যে নূতন আইনের দ্বারা গভর্মেণ্ট খাজনাবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতেছেন, তখন মুণ্ডাদের যতটুকু ভূমিস্বত্ব সে সময় পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিল, তাহাও বহু ক্ষেত্রে সন্দেহ অথবা ভয়ের বশে গভর্মেণ্টের আপিসে গিয়া তাহারা রেজিস্টারি করাইয়া আসে নাই। খৃষ্টীয় ধর্মযাজকগণ কোলভাষায় আইনের অনুবাদ করিয়া সকলকে বুঝানো সত্ত্বেও খৃষ্টান ভিন্ন অপর শ্রেণীর মুণ্ডা বা উরাঁওগণ স্বীয় বুদ্ধির দোষে এইরূপে নিজের সর্বনাশ যেন আরও দ্রুত ডাকিয়া আনিল।

ভূমিস্বত্বের ব্যাপারে ধর্মযাজকগণের সহায়তায় কিছু অগ্রসর হইবার পর, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টধর্মাবলম্বী মুণ্ডা এবং উরাঁওগণ এক নূতন আন্দোলন শুরু করিয়া দেয়। ঐ বৎসর ২৫এ মার্চ তারিখে ছোটনাগপুরের আট পরগণার ১৪,০০০ হাজার খৃষ্টান অধিবাসী কমিশনার সাহেবের নিকট এক দরখাস্ত করিয়া জানায় যে, 'ছোটনাগপুর মুণ্ডা ভিন্ন অপর কোনো জাতির সম্পত্তি হইতে পারে না। ঠিকাদার, এলাকাদার বা নাগবংশী, কাহারও এখানে অধিকার নাই......তাহারা এমন কি করিয়াছে যাহার জন্য মুণ্ডারা তাহাদিগকে জমি দান করিবে? মুণ্ডাদের কি ক্ষুধা নাই? মানুষে এক পোয়া চাউল পর্যন্ত দান করিতে পারে না, আর এই বিশাল রাজ্য মুণ্ডাজাতি নাগবংশীদের দিয়া দিয়াছিল'? ১৮৮১ সালে উপরোক্ত সরদার লড়াই-এর মধ্যে এক বিচিত্র পরিণতি দেখা যায়। 'জন দি ব্যাপটিস্ট' নামধারী এক ব্যক্তির নেতৃত্বাধীনে কিছু লোক নিজেদের 'মাইলের সন্তান' আখ্যা দিয়া দোইসানগরের

পরিত্যক্ত রাজপ্রাসাদ দখল করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। কিন্তু সরকার অল্প দিনের মধ্যেই দৃঢ়তার সহিত সরদার বিদ্রোহ দমন করিতে সক্ষম হইলেন।

এই সময় বরাবর পূর্বে প্রবর্তিত জমিদারের অধীন পুলিশবাহিনী রক্ষা করিবার জন্য গভর্মেণ্ট যে নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছিলেন, সে ব্যবস্থার প্রত্যাহার করা হইল। কিন্তু প্রজার অসন্তোষ ইহাতে প্রশমিত হইল না। বারংবার সরকারী অব্যবস্থা বা খণ্ড-ব্যবস্থার ফলে এবং বিদ্রোহদমনে সরকারের অস্ত্রবলের পরিচয় পাইয়া মুণ্ডাগণের অসন্তোষ এবার নূতন পথে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। জমিদারশ্রেণীর বিরুদ্ধে তাহারা প্রকাশ্য বিদ্রোহ না করিয়া আইন এবং আদালতের আশ্রয় লইল। ১৮৭১ সালে কর্নেল ডালটন লিখিয়াছিলেন যে, এরূপ দ্বন্দ্বের ফলে বুদ্ধির ব্যাপারে মামলা-মোকদ্দমায় পরাস্ত হইয়া মুণ্ডা-জাতিকে যতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় তাহা পূর্বে আর কখনও ঘটে নাই।

বহুবিধ শোষণ এবং রাষ্ট্রের অবহেলার মধ্যে মুণ্ডাজাতি ক্রমশ ইহাই হৃদয়ঙ্গম করিল যে পুরানো দিনের স্বাধীনতা আর ফিরিয়া আসিবে না। আগন্তুক অসংখ্য ব্যক্তির দৃষ্টি ছোটনাগপুরের অরণ্যভূমির উপরে নিপতিত হইয়াছে এবং তাহাদের বুদ্ধি বা অস্ত্রশক্তির সম্মুখে দাঁড়ানো খুব কঠিন ব্যাপার। তাহা সত্ত্বেও ১৮৮৯-৯০ সালে বিদ্রোহের চেষ্টা হয়। শেষবারের মত আবার মুণ্ডারা ১৮৯৯-১৯০০ সালে বিরসা মুণ্ডা নামক জনৈক ব্যক্তির নেতৃত্বাধীনে বিদ্রোহী হইয়া ছোটনাগপুর হইতে যাবতীয় বিদেশীকে বিতাড়িত করার ব্যর্থ চেষ্টা করে। রুদু এবং কোণ্টা মুণ্ডার মত বিরসা মুণ্ডাকেও এবার সরকারী জেলখানার মধ্যে দেহরক্ষা করিতে হয় এবং তাহার অনুচরবর্গের মধ্যে কাহারও বা ফাঁসি হয়, কেহবা দীর্ঘদিনের মেয়াদে কারাগারে আবদ্ধ থাকে।

বিরসা-আন্দোলন প্রশমিত হইলে পর ইংরেজ সরকার নূতন কতকগুলি আইনপ্রণয়নের দ্বারা জায়গিরদার ও ঠিকাদারশ্রেণীর অত্যাচার হইতে মুণ্ডা প্রজাকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করেন। এই সময়ে ফাদার হফম্যান নামক জনৈক ধর্মযাজক মুণ্ডাদের পক্ষ লইয়া

মুণ্ডাদের ভূমিস্বত্ব সম্পর্কিত আইন এবং অধিকারের প্রকৃতি সম্বন্ধে গভর্মেণ্টকে বুঝাইবার ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। তদানীন্তন গভর্মেণ্ট কর্তৃক ১৯০৯ সালে তিন আইন এবং পাঁচ আইন প্রবর্তিত হইবার ফলে অবশেষে মুণ্ডাজাতি সত্যসত্যই যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিবার সুযোগ লাভ করিল।

সংস্কৃতিগত পরিবর্তনের ধারা

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, ভূমিস্বত্ব অথবা সমাজ-ব্যবস্থার ব্যাপারে ব্রাহ্মণশাসিত জাতিবৃন্দের সহিত মুণ্ডাদের যথেষ্ট প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও অন্নোৎপাদনের সমগ্র ব্যবস্থায় মুণ্ডাজাতির উপরে অবশিষ্ট হিন্দুসমাজের প্রভাব অলক্ষিতে, কিন্তু গভীরভাবে, সংক্রামিত হইতেছিল। জমিদার বা ঠিকাদারশ্রেণী যখন ক্রমশ ছোটনাগপুরে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল তখন তাহাদের অনুসরণ করিয়া অপরাপর চাষী ছুতার কামার নাপিত তেলী বা কাঁসারি প্রভৃতি জাতিও আসিয়া উপস্থিত হইল। জমিদারের বিরুদ্ধে যতই আপত্তি থাকুক না কেন, ইহাদের শিল্পবিদ্যা বা বৃত্তির বিরুদ্ধে মুণ্ডাদের কোনো আপত্তি ছিল না। উন্নততর উৎপাদনব্যবস্থায় সহজে আপত্তি হইবার তো কথা নয়। সেইজন্য কার্যত সে ব্যবস্থাকে মুণ্ডা বা উরাঁও জাতি স্বীকার করিয়া লইল। তাহারা নিজেদের চাষী জাতি বলিয়া গণ্য করিতে লাগিল এবং ্যুত হইবার ভয়ে তেলী বা কামার-কুমারের বৃত্তিতে হাত দিতে করিল। অর্থাৎ ব্রাহ্মণশাসিত সমাজের উৎপাদনব্যবস্থার নিকট আত্মসমর্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে পরোক্ষভাবে তাহারা জাতিভেদ-প্রথা বা বর্ণধর্ম এক দিক দিয়া স্বীকার করিয়াই লইল।

খৃষ্টীয় ধর্মযাজকগণের নিকট গভীর ঋণ থাকা সত্ত্বেও তাঁহাদের সুশিক্ষা এবং সহানুভূতি বা প্রেম উপরোক্ত পরিণতি হইতে মুণ্ডা-জাতিকে রক্ষা করিতে পারে নাই। প্রথম প্রথম খৃষ্টীয় ধর্মযাজকগণ যখন মুণ্ডাদের পক্ষ লইয়া সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সর্বত্র খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হইবার জন্য একটি বিপুল আগ্রহ দেখা যায়। স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র রায় লিখিয়া গিয়াছেন যে, ছোটনাগপুরের অধিবাসি-

গণের মধ্যে বির-হড়, কোড়োয়া বা অসুরদের মত যাহাদের ভূমি ছিল না, অথবা মহাজনের সহিত যাহাদের টাকার কারবার ছিল না, তাহারা বরাবর খৃষ্টান মিশনারিগণের প্রভাব হইতে দূরে ছিল; কিন্তু অপর পক্ষে, আর্থিক দুর্দিনের সময়ে যাহারা চাষের কাজ করিত, তাহাদেরই মধ্যে খৃষ্টীয় প্রভাব সমধিক প্রসার লাভ করিত।

এই সম্পর্কে একটি বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন। খৃষ্টীয় ধর্মযাজকগণ নিপীড়িত প্রজাবৃন্দের পক্ষ আন্তরিকতার সহিত সমর্থন করিলেও কোনদিন গভর্মেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে সমর্থন করেন নাই। তাঁহারা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সর্বদা দুর্দশার প্রতিকারের চেষ্টা করিতেন। তাঁহারা একদিকে যেমন গভর্মেণ্টকে মুণ্ডাজাতির প্রাচীন স্বত্ব সম্পর্কে সচেতন করিয়া দিতেন, তেমনই আবার শিক্ষাবিস্তারের দ্বারা, নানাবিধ শিল্পবিদ্যা শিখাইয়া, সমবায় সমিতি স্থাপন করিয়া প্রজাবৃন্দের আর্থিক উন্নতির জন্যও তেমনই সর্ববিধ চেষ্টা করিতেন। এইসকল শিক্ষা এবং আদর্শ যথাযথভাবে আয়ত্ত করিতে পারিলে ছোটনাগপুরের অধিবাসীগণের পক্ষে ব্রাহ্মণশাসিত সমাজের উৎপাদনব্যবস্থা অনুকরণ করা অপেক্ষা বেশি লাভ হইত সন্দেহ নাই। তথাপি, বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে মনে হয়, সমগ্র ছোটনাগপুরেই যেন খৃষ্টীয় প্রভাব বা শিক্ষা পূর্বের মত আর অগ্রসর হইতেছে না। এবং ইহার কারণ মুণ্ডা বা উরাঁও সমাজের মধ্যেই নিহিত আছে। তাহারা ঐ পথে না গিয়া বরং বর্ণাশ্রম বা জাতিভেদযুক্ত সমাজের মধ্যে অংগীভূত হইবার, বা ঐ সমাজের মধ্যেই আরও উন্নত পদ বা মর্যাদার অধিকারী হইবার জন্য যেন বেশি চেষ্টা করিতেছে। এই বিচিত্র আচরণের কারণ কি?

ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হইয়াছে যে, ইহার দুইটি কারণ আছে। প্রথম হইল, মুণ্ডা উরাঁওদের আশেপাশে চারিদিকে শ্রমবিভাগ ও জাতিভেদের উপরে প্রতিষ্ঠিত সমাজের নিয়মাবলী আশ্রয় করিয়া বহু মানুষ তাহাদের চেয়ে অনেক সুখে সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছিল। ইহার একটি প্রচণ্ড আকর্ষণ আছে। দ্বিতীয়ত, খৃষ্টান ধর্মযাজকগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করার ব্যাপারে একদিক দিয়া নূতন একটি বাধার উদয় হইল। ক্রমবর্ধমান শোষণের

বিরুদ্ধে মুণ্ডা জাতি যখন মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া বারংবার বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছিল, সেই ভাবের ঘোর প্লাবনের দিনে ধর্মযাজকগণ তাহাদিগকে নিয়মতান্ত্রিক পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিয়াও সফল হন নাই। কিন্তু তাঁহারা বিদ্রোহকে কিছুতে সমর্থন করিতে পারেন নাই। সেই উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থার মধ্যে প্রেম বা ঐক্যের সম্পর্কে যেখানে চিড় খাইয়া গেল, আমার মনে হয়, উত্তরকালে সেইখানে আর পূর্বের মত জোড়া লাগে নাই। বিরসা মুণ্ডা স্বয়ং চাঁইবাসাতে জার্মান মিশনারি ইস্কুলের ছাত্র ছিলেন। ১৮৯৯ সালের বিদ্রোহের সময়ে তিনি এক নূতন ধর্মের প্রবর্তন করেন। সে ধর্মে খৃষ্টীয় একেশ্বরবাদের সহিত উপবীতগ্রহণ, শুদ্ধাচার প্রভৃতি একত্র স্থান পায়। এই বিচিত্র অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বিদ্রোহ খৃষ্টীয় ধর্মযাজকগণের সহানুভূতি লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। ফলে বিদ্রোহের সময়ে বিরসার অনুচরবর্গ রাঁচি জেলায় নানা স্থানে খৃষ্টীয় ধর্মমন্দির অথবা ধর্মযাজকগণকে পর্যন্ত আক্রমণ করিতে ইতস্তত করে নাই। ১৮৭৯-৮১ সালে খৃষ্টধর্মাবলম্বী কয়েক সহস্র মুণ্ডা এবং উরাঁও যখন সরদার লড়াই-এ লিপ্ত হয়, তখন তাহারাও মিশনারিগণের সমর্থন লাভ করে নাই।

বোধ হয় উপরোক্ত দুই কারণের ফলে হিন্দু এবং মুসলমান জমিদার বা ব্যবসাদারশ্রেণী কর্তৃক শোষিত হওয়া সত্ত্বেও ছোটনাগপুরের অধিবাসিগণ সেই ঘৃণার ভাবকে অতিক্রম করিয়া ভারতীয় উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রতি উত্তরোত্তর আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। খৃষ্টীয় ধর্মযাজকগণের উন্নততর উৎপাদনব্যবস্থা অপেক্ষা জাতিভেদমূলক প্রাচীন ব্যবস্থাই তাহাদের সমধিক প্রিয় হইয়া দাঁড়ায়।

হয়তো তৃতীয় একটি কারণও ইহার জন্য দায়ী হইতে পারে। মুণ্ডা বা উরাঁওগণের মধ্যে যাঁহারা খৃষ্টান হইত, তাহাদের সহিত অবশিষ্ট সকলের সম্পর্ক যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত। পোশাকপরিচ্ছদে এবং দৈনন্দিন আচরণে উভয়ের মধ্যে এত প্রভেদ দেখা দিত যে, উন্নততর শ্রেণীর প্রভাব অনেক সময়ে অবশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে সঞ্চারিত হইত না।

হয়তো সমগ্র মুণ্ডা বা উরাঁও অধিবাসিগণের তুলনায় মিশনারিদের দ্বারা প্রভাবান্বিত ব্যক্তিবৃন্দের সংখ্যা অনুপাতে কম ছিল এবং জাতি-ভেদবহির্ভূত উন্নততর উৎপাদনব্যবস্থা সে কারণেও অপরের মধ্যে প্রসারলাভ না করিয়া থাকিতে পারে। প্রাচীন ব্যবস্থার তখনও যথেষ্ট আয়ু এবং যথেষ্ট শক্তি ছিল। এইসকল বিবিধ কারণ মিশিয়া ছোটনাগপুরে বিভিন্ন জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণশাসিত সমাজের আদর্শ এবং প্রভাবই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সেই প্রভাবের ফলে খৃষ্টীয় সমাজের বহির্ভূত অবশিষ্ট ব্যক্তিগণের সংস্কৃতির মধ্যে সম্প্রতি কি কি পরিণতি ঘটিয়াছে, কয়েকটি সামাজিক আন্দোলনের বিশ্লেষণের সাহায্যে আমরা তাহারই বিচারে প্রবৃত্ত হইব।

তৃতীয় অধ্যায়

ছোটনাগপুরে ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবের বিস্তার

পাঁচ পরগণায় অবস্থিত মুণ্ডা জাতির শাখা

যাঁহারা মুণ্ডাজাতির ইতিহাস লইয়া গবেষণা করিয়াছেন তাঁহারা বলেন, মুণ্ডাজাতি উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে রাঁচি জেলার মধ্যে আসিয়া পৌঁছায়। তাহার পর ঐ পথ ধরিয়াই দ্রাবিড় ভাষাভাষী উরাঁও জাতি আসিয়া উপস্থিত হয়। ফলে মুণ্ডাগণ ক্রমশ জেলার পূর্বভাগে সরিয়া যাইতে বাধ্য হয়। অবশেষে সুবর্ণরেখা নদী অতিক্রম করিয়া তাহারা মানভূম জেলার পশ্চিমাংশে ঝালদা বেগুনকোদর পাতকুম প্রভৃতি পরগণায় আশ্রয় লয়। কিন্তু সেখানে তাহাদের পক্ষে বেশি দিন থাকা সম্ভব হয় নাই। মানভূমে কুর্মিজাতি চাষের জন্য ভাল জমির সন্ধানে জেলার পশ্চিম দিকে চাপ দিতে থাকিলে মুণ্ডারা আবার সুবর্ণরেখা পার হইয়া অবশেষে রাঁচি জেলার অন্তর্গত সিল্লি বুণ্ডু বরণ্ড রাহে এবং তামাড় নামক পাঁচটি পরগণায় আশ্রয় লয়।

মুণ্ডারা বহুকালাবধি চাষের কাজ করিয়া আসিতেছে এবং জাতি-অনুসারে বৃত্তিনিয়োগের ব্যবস্থা স্বীকার করিয়া তাঁতি কামার প্রভৃতি জাতির সহযোগিতায় জীবনযাপন করিয়া আসিতেছে—ইহা বলা হইয়াছে। কিন্তু রাঁচি জেলার সর্বত্র ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির প্রভাব তাহাদের উপরে সমানভাবে পড়ে নাই। কোথাও তাহার মাত্রা কম, কোথাও বেশি। স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন, মুণ্ডাদের বিবাহে সর্বত্র হলুদ মাখিবার রীতি, বর ও কন্যার পক্ষে পরস্পরকে সিন্দুরদান, ধর্মানুষ্ঠানে উপবাস ও স্নানের বিধি ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবের সাক্ষ্য দেয়। তামাড় পরগণায় এই প্রভাব আরও বেশি পরিলক্ষিত হয়। সেখানে বিবাহের মধ্যে বরণ-ডালা পর্যন্ত স্থান পাইয়াছে। উপরন্তু সিল্লি এবং তামাড়ে বিবাহকার্য

শেষ হইলে মুণ্ডা স্ত্রীপুরুষ সকলে মিলিয়া উচ্চৈঃস্বরে 'হরিবোল, হরিবোল' উচ্চারণ করিয়া থাকে।

শরৎচন্দ্র পাঁচপরগণায় প্রচলিত খাঁটি মুণ্ডাভাষায় রচিত গানের মধ্যে কিভাবে পার্শ্ববর্তী বৈষ্ণবগণের প্রভাব প্রস্ফুটিত হইয়াছে তাহার সুন্দর উদাহরণ দিয়াছেন। নীচে সেইরূপ একটি গান ও তাহার অনুবাদ উদ্ধৃত করা হইল,

> যমুনা গাড়া জপা, বুরু গিতিল কদম সুবা
> তিরি-রিরি রুতু সারিতানা
> মাঁদ সাকাম চোরো রোরো
> সোবেন হাইকো নিরতানা
> কারাকোম দো দুআর-রে দুবকনা লান্দাতানাএ।

যমুনা নদীর কাছে (অর্থাৎ কূলে), বালির পাহাড়ের উপরে, কদম গাছের মূলে, বাঁশের বাঁশি তিরি-রিরি করিয়া বাজিতেছে। বাঁশপাতি মাছ, চ্যাং, মাগুর, সকল মাছ [আনন্দে] দৌড়াইতেছে। কাঁকড়া [আপন গর্তের] দুয়ারে বসিয়া [তাহা দেখিয়া] হাসিতেছে।

পাঁচপরগণার অধিবাসী মুণ্ডাদের মধ্যে কেহ কেহ বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা-গ্রহণ করিয়াছে। তদ্ভিন্ন যেসকল মুণ্ডার আচার ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবের দ্বারা অল্পবিস্তর পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে তাহারা নিজেদের ভুঁইহারী ছত্রী নামে পরিচয় দেয়। কেহ কেহ মুণ্ডা নাম এখনও পরিহার করে নাই বটে, কিন্তু রাঁচি জেলার অপরাপর পরগণায় অবস্থিত অপর মুণ্ডাদের সহিত নিজেদের একপর্যায়ে ফেলিতে চায় না; কারণ তাহাদের আচার এখনও যথেষ্ট শুদ্ধ হয় নাই। সেইসকল মুণ্ডা উরাঁওদের মত গোমাংস ভক্ষণ করে বলিয়া পাঁচপরগণার অপেক্ষাকৃত শুদ্ধাচারী মুণ্ডাগণ তাহাদিগকে মুণ্ডারি অথবা উরাং-মুণ্ডা নামে অভিহিত করে।

অন্যান্য বিষয়ে ব্রাহ্মণ্য আচারব্যবহার গ্রহণ করিলেও পাঁচপরগণার মুণ্ডারা প্রাচীন গ্রামদেবতাদের পূজা ছাড়ে নাই। স্বীয় জাতীয় ধর্মের অপর দেবদেবীর পরিবর্তে তাহারা মহাদেবের পূজা করিয়া থাকে। জুয়াঙ্গ জাতি যেমন লক্ষ্মীদেবীর নামে মোরগ বলি দেয়, ইহারাও

তেমনই মহাদেবের নিকট পশুবলি দিয়া থাকে, অথচ ব্রাহ্মণশাসনের অধীন সেরূপ রীতি কোথাও প্রচলিত নাই। পাঁচপরগণার মুণ্ডাদের কিল্লি বা গোত্রের মধ্যেও কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। সাণ্ডি কিল্লি ('সাণ্ডি' শব্দের অর্থ পুরুষ) সাণ্ডিল গোত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে এবং মুণ্ডারা এখন বিশ্বাস করে যে শাণ্ডিল্য ঋষি উপরোক্ত গোত্রের আদিপুরুষ। সোনাহাতু থানার অধিকাংশ মুণ্ডা সাণ্ডিল গোত্রের অন্তর্গত। তাহারা পরস্পরের মধ্যে বিবাহ দিয়া থাকে; কিন্তু এরূপ সগোত্র-বিবাহ ব্রাহ্মণ্য অথবা খাঁটি মুণ্ডা সমাজে কোথাও প্রচলিত নাই। শরৎচন্দ্র অনুমান করিয়াছেন, হয়তো বিভিন্ন মুণ্ডা কিল্লির লোক হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবার চেষ্টায় সাণ্ডিল গোত্র আশ্রয় করিয়াছিল বলিয়া পরবর্তীকালে এইরূপ 'সগোত্র' বিবাহ সম্ভব হইয়াছে।

মাণ্ডা পরব

রাঁচি জেলায় গ্রীষ্মকালে মাণ্ডা পরব নামে একটি পরবের অনুষ্ঠান হয়। ইহাতে কেবল মুণ্ডা বা উরাঁওরা নহে, অপর নানা জাতিও যোগ দিয়া থাকে। টাংরাটোলি নামক এক গ্রামে লোহার আহির এবং মুধা অর্থাৎ ডোমজাতীয় ব্যক্তিকেও মাণ্ডা পরবে যোগ দিতে দেখিয়াছি। যাহারা মাণ্ডা পরবে যোগ দেয় তাহারা কয়েকদিন যাবৎ সাত্ত্বিকভাবে শুদ্ধাচারে আহারবিহার করে। সে সময়ে বৈষ্ণব গোঁসাই তাহাদের জন্য পৌরোহিত্য করেন এবং মহাদেবের আস্থানে নানাবিধ পূজার অনুষ্ঠান হয়।

রাঁচি শহরের পার্শ্ববর্তী মোরহাবাদি, টাংরাটোলি এবং দূরবর্তী আরও অনেক গ্রামে বেশ আড়ম্বরের সহিত মাণ্ডা পরব অনুষ্ঠিত হয়। বস্তুত ইহা বাঙলা দেশের চড়ক উৎসব ভিন্ন অপর কিছু নয়। তবে চড়কপূজা যেমন চৈত্র মাসে হয়, মাণ্ডা পরবের সেরূপ সময়ের কোনো বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। সচরাচর বৈশাখ অথবা জ্যৈষ্ঠ মাসে, বৈষ্ণব গোঁসাইয়ের সুবিধা অনুসারে, বিভিন্ন গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন দিনে মাণ্ডা পরবের পালা পড়িয়া থাকে।

উরাঁও মুণ্ডা আহির প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির যেসকল ব্যক্তি ভোক্তা অর্থাৎ গাজনের সন্ন্যাসী হয়, তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও উপরে প্রথমে মহাদেবের ভর নামে। ভর হইলে সে ব্যক্তি মনে করে যে ভোক্তা হইবার জন্য সে প্রত্যাদেশ পাইয়াছে। অবশ্য এরূপ প্রত্যাদেশ লাভ না করিলেও ভোক্তা হইতে কোনও বাধা নাই। মাণ্ডা পরবের সূচনায় মোরহাবাদি গ্রামে দেখিয়াছি, জনৈক রামায়েৎ গোঁসাই ভোক্তাগণকে যজ্ঞোপবীতে ভূষিত করেন এবং পরবর্তী তিন দিন তাহারা মাছ মাংস নুন হলুদ ও মশলা বাদ দিয়া কেবল দুধ ভাত ফল ও মিষ্টান্ন আহার করিয়া থাকে।

ভোক্তাগণ প্রতিদিন বিচিত্র বেশভূষা পরিয়া গৃহস্থের দুয়ারে দুয়ারে বাজনা বাজাইয়া ভিক্ষা করে। সে সময়ে মহাদেবের আস্থানে রক্ষিত লোহার কতকগুলি পেরেকবিদ্ধ কাঠের একটি পাটাকে তাহারা মাথায় করিয়া ভক্তিভরে লইয়া যায়। এই কাঠের খণ্ডকে তাহারা পার্বতীদেবীর মূর্তি বলিয়া বিবেচনা করে। উৎসবের দ্বিতীয় দিবসে মহাদেবের আস্থানে সমবেত হইয়া ভোক্তাগণকে কতকগুলি আচার পালন করিতে হয়। তাহার মধ্যে দুইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটির নাম কান্ধাইয়া, অপরটির নাম ফুলকুদনা। কান্ধাইয়ার সময়ে ভোক্তাগণ সারবন্দী হইয়া বসিয়া থাকে এবং গোঁসাই তাহাদের কাঁধের উপরে পর পর পা দিয়া অনেকখানি ভূমি অতিক্রম করিয়া মহাদেবের আস্থানে প্রবেশ করেন। ভোক্তাদের সংখ্যা কম হইলে যাহাদের কাঁধে পা রাখিয়া হাঁটা শেষ হইয়াছে, তাহারা আবার সামনে আসিয়া উবু হইয়া বসিয়া পড়ে। এই ক্রিয়াটির দ্বারা ভোক্তাগণ গোঁসাইএর নিকট একান্তভাবে নিজেদের দৈন্য স্বীকার করে।

দ্বিতীয় আচারটির নাম ফুলকুদনা, অর্থাৎ ফুলের উপর দিয়া লাফানো বা চলা। ইহা আরম্ভ হইতে রাত্রি প্রায় নয়টা-দশটা বাজিয়া যায়। মহাদেবস্থানের নিকট আট-দশ হাত লম্বা ও দুই হাত চওড়া এবং আধ হাতের কিছু বেশি গভীর একটি চুলি কাটা হয়। ইহাতে উঁচু করিয়া কাঠকয়লা সাজাইয়া কুলার বাতাসের সাহায্যে জোর আগুন ধরানো হয়। আঁচ বেশ গনগনে হইলে পুরোহিত প্রথমে উহার উপরে

মন্ত্রপূত জল ছিটাইয়া দেন। ভোক্তাগণ পুষ্করিণীতে স্নান সারিয়া ভিজা কাপড়ে সারবন্দী ভাবে ধীরে ধীরে তখন সেই আগুনের উপর দিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করে। শুধু একবার নয়, পর পর তাহারা তিনবার চুলির উপর দিয়া লম্বালম্বি ভাবে হাঁটে। একবার দেখিয়াছিলাম, অল্প-বয়স্ক একজন বালক ভোক্তা ভয় পাইয়া ছুটিয়া চলিবার চেষ্টা করিতেই বয়স্ক দু-একজন তাহাকে সংযত করিয়া আস্তে আস্তে চলিতে বাধ্য করিল। ঘড়ি ধরিয়া দেখা গিয়াছে যে, প্রতিবারে দুই তিন সেকেণ্ড, অর্থাৎ তিনবারে মোট আট নয় সেকেণ্ড জ্বলন্ত কাঠকয়লার উপর দিয়া হাঁটা সত্ত্বেও একজনেরও পায়ে ফোস্কা পড়ে না; পা পুড়িয়া যাওয়া তো অনেক দূরের কথা। প্রতি ভোক্তার সহিত তাহার পরিচর্যা করিবার জন্য মা, বোন অথবা অপর কোনও স্ত্রীলোক থাকে। তাহারাও ভোক্তাদের সঙ্গে সমানভাবে ঐ কয়দিন ব্রতনিয়ম পালন করিয়া চলে। ইহাদিগকে সোকথাইন বলে। ভোক্তাগণের ফুলকুদনার পালা শেষ হইলে সোকথাইনগণও আগুনের উপর দিয়া হাঁটিয়া যায়। তাহাদেরও পায়ে বিন্দুমাত্র দাগ পড়ে না, এবং তাহারাও হাঁটার সময়ে একটুও বিচলিত হয় না। একজন সোকথাইনকে আমি ফুলকুদনার পরের দিন জিজ্ঞাসা করায় সে একান্ত সরল বিশ্বাসে বলিয়াছিল, পার্বতীদেবী ঐ সময়ে আগুনের উপরে নিজের আঁচল বিছাইয়া দেন বলিয়া কাহারও গায়ে আঁচ লাগে না।

ভোক্তা এবং সোকথাইনগণের হাঁটা শেষ হইলে আমার এক বন্ধু দৌড়াইয়া আগুন পার হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পায়ে ফোস্কা পড়িয়াছিল। অপর একজন, সেদিন ভোক্তাগণের সঙ্গে যথারীতি উপবাস করিয়া ফুলকুদনার পূর্বমুহূর্তে স্নান করিয়াছিলেন। একটু ভয় ভয় করিতেছিল বলিয়া তিনি দৌড়াইয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার পায়ে ফোস্কা পড়ে নাই। তাঁহার ধারণা, শুধু পায়ে সদাসর্বদা হাঁটার অভ্যাস আছে বলিয়া ভোক্তাগণের পা এমনিই কড়া। তাহার উপরে আবার সদ্যসদ্য স্নানের পর ভিজা কাপড়ে তাহারা মহাদেবস্থানের নিকট ফুলকুদনার জন্য যায় বলিয়া পায়ের পাতায় ধূলা বা মাটি লাগিয়া থাকে; সেই আবরণের জন্যই আগুনে হাঁটা হয়তো সম্ভব হয়। কথাটি

কোলেদের দেশ

বৃদ্ধা উরাঁও-রমণী

ভোক্তাদের সজ্জা

মাণ্ডা-পরবে আগুনের উপর দিয়া হাঁটা

আংশিকভাবে সত্য হইতে পারে। কিন্তু আট-দশ বছরের ছোট ছেলেকেও ফুলকুদনায় যোগ দিতে দেখা যায়। তাহাদের পা ছোট, চামড়া অপেক্ষাকৃত নরম, তবু কিছু হয় না।

আবার রাঁচি শহর হইতে দূরে, খুঁটি-মহকুমার অন্তর্গত একটি গ্রামে শুনিয়াছি যে, ভোক্তাগণ শুধু আগুনের উপর দিয়া হাঁটিয়া ক্ষান্ত হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত কাঠকয়লার আগুন নিভিয়া না যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত সকলে মিলিয়া তাহার উপরে নাচিয়া পায়ে করিয়া কয়লা চতুর্দিকে ছড়াইতে থাকে। যাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারা বলেন যে, ইহা সত্ত্বেও ভোক্তাগণের পায়ের কোনো অনিষ্ট হয় না।

ফুলকুদনা শেষ হইলে সারারাত ধরিয়া মুণ্ডাদের বিভিন্ন পাড়া হইতে সমবেত দলের নাচের প্রতিযোগিতা হয়। স্থানীয় মানকি সভায় উপস্থিত থাকেন। নাচগানের মধ্যে আবার মুখোস পরিয়া রাম রাবণ ভীম অর্জুন প্রভৃতি সাজিয়া কেহ কেহ নাচিয়া থাকে; তবে যাত্রার মত কোনো সমগ্র পালাগান গাওয়া হয় না। পরদিন বাঙলা দেশের মত চড়ক-গাছে চড়িয়া ভোক্তাদের ঘুরিতে হয়। এই সময়ে ছোটখাটো মেলা বসে এবং মেলা শেষ হইলে মাণ্ডা পরবেরও পরিসমাপ্তি ঘটে।

উরাঁও জাতির মধ্যে সামাজিক আন্দোলন

এইবার উরাঁও জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ্যপ্রভাববশত যেসকল সামাজিক আন্দোলন উদ্ভূত হইয়াছে, সেগুলির বিষয়ে আলোচনা করা যাক। উরাঁও জাতির মধ্যে ভুঁইফুট ভগৎ, নেম্‌হা ভগৎ, বিষ্ণু বা বাচ্ছিদান ভগৎ, কবিরপন্থী প্রভৃতি কয়েক শ্রেণীর ভক্তিবাদী সম্প্রদায় আছে। মুণ্ডাজাতির মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ্যপ্রভাব মানভূমের সমীপবর্তী অঞ্চলে বেশি, অবশিষ্ট যাহা আছে তাহা বহুদিন হইতে ওতঃপ্রোতোভাবে মুণ্ডা সংস্কৃতিতে মিশিয়া গিয়াছে, উরাঁওদের বেলায় তেমনই হিন্দুপ্রভাব বিহারের গয়া এবং সাহাবাদ জেলা, মধ্যপ্রদেশের রায়পুর ও বিলাসপুর জেলা, উড়িষ্যার সম্বলপুর ও গাংপুর রাজ্যের দিক দিয়া আসিয়াছে।

ভুঁইফুট, নেম্‌হা আদি যে কয়টি ভক্তিমার্গী সম্প্রদায়ের নাম করা হইয়াছে, সেগুলি খুব বেশি পুরানো নয়। যতদূর মনে হয়, সাত বা

আট পুরুষ পূর্বে এগুলির প্রথম উন্মেষ হয়। ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিবার পর উরাঁওগণ যথাসাধ্য শুদ্ধাচারী হয় এবং প্রাচীন জাতীয় আচার ব্যবহারের মধ্যে ভক্তিবিরোধী আচার যথাসম্ভব পরিহার করিয়া চলে। অথচ প্রাচীনপন্থী পরিবারের সহিত তাহাদের বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় না, বরং সেরূপ বিবাহ প্রায়ই ঘটিয়া থাকে।

ভুঁইফুট ভগৎ—কোনো উরাঁও-এর নিকট জাতিগত আচার ঘৃণ্য বলিয়া মনে হইলে ক্রমে তাহার মনের অসন্তোষ বৃদ্ধি পায় এবং সে শুদ্ধাচারী হইবার সুযোগ খোঁজে। এমন সময়ে একদিন সে হয়তো অকস্মাৎ স্বপ্ন দেখে যে মহাদেব তাহার গৃহে আবির্ভূত হইয়াছেন। বস্তুত স্বপ্নভঙ্গের পর সেই বাড়ির কোনো ঘরে বা আঙিনায় একখণ্ড পাথর মাটি ফুঁড়িয়া বাহির হইয়াছে দেখা যায়। তখন সে ব্যক্তি ভুঁইফুট মহাদেবের পূজা করে এবং সযত্নে গৃহের অপরাপর অংশ হইতে সেই পাথরটিকে ঘেরিয়া বা ছাউনি দিয়া আলাদা করিয়া রাখে। অতঃপর সেই উরাঁও শুদ্ধাচারে চলিবার চেষ্টা করে। সে আর গোরু, শুয়ার বা ছাগীর মাংস খায় না, কেবল ছাগমাংস আহার করে; মদ পরিহার করে; স্বজাতির সঙ্গে এক পংক্তিতে ভোজনে বসে না, সামাজিক নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া বাড়িতে সিধা লইয়া আসে। ভুঁইফুট ভগতেরা কিন্তু মহাদেবের নিকটে পশুবলি দেয়, যদিও হিন্দুদের মধ্যে ঐরূপ কোনও [illegible] প্রচলিত নাই। পরন্তু উহারা গ্রামদেবতার পূজা বা পিতৃপুরুষের তর্পণ পূর্বপ্রথা অনুযায়ী করিয়া থাকে; তবে বলি দেয় না, বা গ্রামের পূজায় দেয় চাঁদাটুকু দিয়া নিরস্ত হয়।

নেম্‌হা ভগৎ—প্রায় আট নয় পুরুষ পূর্বে রাঁচি জেলায় প্রথম নেম্‌হা ভক্তিপন্থার উদয় হয়। নেম্‌হা ভগৎগণ খাওয়াদাওয়া সম্বন্ধে নিয়ম পালন করিয়া চলে বলিয়া উহাদের নেম্‌হা অর্থাৎ নিয়মওয়ালা নাম হইয়াছে।

বিষ্ণু ভগৎ—ভগৎবংশের কোন কোন উরাঁও দরিদ্র যজমান-সন্ধানী ব্রাহ্মণ অথবা গোঁসাই বা বৈষ্ণব বৈরাগীর নিকটে মন্ত্র লইতে আরম্ভ করিয়াছে। এইসকল গুরুবৃত্তিধারী ব্যক্তি গয়া এবং সাহাবাদ জেলা হইতে আসিয়া উরাঁও শিষ্যের কানে বিষ্ণুমন্ত্র বা কৃষ্ণনাম দিয়া থাকেন।

শিষ্য পূর্বকর্মের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ গুরুকে যথারীতি গোবৎস দান করে। এই কারণে এইরূপে দীক্ষিত ভক্তকে কান-ফুট ভগৎ বা বাছিছদান ভগৎ, অথবা সোজাসুজি বিষ্ণু ভগৎ বলা হয়। ইহারা ভুঁইফুট ভগৎগণ অপেক্ষা শুদ্ধাচারী, কোনরকম মাংসই খায় না।

কবীরপন্থী ভগৎ—ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রায়পুর এবং বিলাসপুর জেলা হইতে কবীর সম্প্রদায়ের প্রভাব রাঁচি জেলায় প্রবেশ-লাভ করে। সম্বলপুর জেলায় যেমন কবীরপন্থীদের প্রাদুর্ভাব আছে, তেমনই গাংপুর এবং রাঁচি জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে সিমডেগা অঞ্চলের উরাঁওগণ ঐ আন্দোলনে কিয়ৎ পরিমাণে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল।

কবীরপন্থিগণ অতিশয় শুদ্ধাচারী। সেইজন্য তাহারা প্রাচীনপন্থী উরাঁও পরিবারে কন্যার বিবাহ দিলেও কন্যাকে আর বাপের বাড়িতে বাপমায়ের জন্য ভাত বা ডাল রাঁধিতে বা পরিবেশন করিতে দেয় না। এমনকি খাইবার সময়ে তাহাকে এক পংক্তিতে বসিতে পর্যন্ত দেওয়া হয় না।

উরাঁও জাতির মধ্যে খৃষ্টান ধর্ম যথেষ্ট প্রবেশলাভ করিয়াছে সত্য; কিন্তু মুণ্ডাদের বেলায় যেমন, এক্ষেত্রেও তেমনই অখৃষ্টান উরাঁওগণ তাহাদের প্রভাবে বিশেষ বদলায় নাই। বস্তুত শরৎচন্দ্র লিখিয়াছেন, দেশে যখন অত্যন্ত আর্থিক দুরবস্থা হয়, সেই সময়ে খৃষ্টান হইবার হিড়িক পড়িয়া যায়। কিন্তু সুদিন ফিরিয়া আসিলে দুই একজন আবার পুনরায় প্রাচীন পথে ফিরিয়া আসে। কিন্তু হিন্দু ধর্মের প্রভাব স্বতন্ত্রভাবে কাজ করে। হিন্দুর তরফ হইতে ধর্মপ্রচারের উল্লেখযোগ্য কোন চেষ্টা হয় না; অথচ উরাঁওগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া হিন্দু আচার-ব্যবহার অবলম্বন করে, কেহ বা বেশি, কেহ কম। ইহার মাত্রা যে কতদূর প্রবল হইতে পারে তাহা টানা ভগৎ বা কুড়ুখ-ধর্মের উৎপত্তি ও বিস্তারের আলোচনা হইতে বুঝা যায়।

টানা ভগৎ আন্দোলন

গুমলা মহকুমার অন্তর্গত বিষুণপুর থানার অধীন বেপারিন-ওয়াটোলি গ্রামে যাত্রা উরাঁও নামে এক ব্যক্তি বাস করিত। ১৯১৪ সালে

তাহার বয়স পঁচিশ বৎসর হইবে। সে ব্যক্তি ঐ বৎসর এপ্রিল মাসে প্রচার করে যে উরাঁও জাতির সর্বপ্রধান দেবতা ধর্মেস তাহাকে প্রত্যাদেশ দিয়াছেন যে, ভূতপ্রেতের পূজা এবং ঝাড়ফুঁকের বিদ্যা পরিহার করিতে হইবে, সর্বপ্রকার পশুবলি, মাংসাহার, মদ্যপান, বিলাস প্রভৃতি হইতে বিরত থাকিতে হইবে। চাষবাস করাও চলিবে না; কারণ চাষের দ্বারা দারিদ্র্য ঘোচে না, দুর্ভিক্ষ নিবারিত হয় না, উপরন্তু গো-জাতিকে অকারণ কষ্ট দেওয়া হয়। উরাঁওগণের পক্ষে অন্য জাতির নিকট কুলিমজুরের কাজ করাও চলিবে না। শীঘ্রই সুদিন আসিতেছে, তখন উরাঁওদিগকে ইহলোকে বা পরলোকে আর কোন কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না। উপরন্তু ভগবান যাত্রাকে এমন কতকগুলি সংগীত বা মন্ত্র দিয়াছেন যাহার ফলে জ্বরজ্বালা, চোখওঠা ও অন্যান্য রোগ সহজে সারিয়া যাইবে।

প্রায় ঐ সময়ে ঘাঘরা থানায় বাটকুরি গ্রামে এক উরাঁও স্ত্রীলোক পুষ্করিণীতে স্নান করিতে গিয়া একদিন অচৈতন্য হইয়া পড়ে এবং মুখে অহরহ বম্‌বম্‌ শব্দ করিতে থাকে। জ্ঞান হইলে সেও যাত্রার মত এক ধর্মনীতির কথা প্রচার করে। দেখিতে দেখিতে সমগ্র রাঁচি জেলায় উরাঁও জাতির মধ্যে এই নূতন ধর্মের আন্দোলন ছড়াইয়া পড়ে এবং স্থানে স্থানে যাত্রার মত নূতন নূতন গুরুর আবির্ভাব হইতে থাকে। অবশেষে ইহা রাঁচি জেলার সীমানা ছাড়াইয়া পশ্চিমে পালামৌ এবং উত্তরে হাজারিবাগ জেলার উরাঁওগণের মধ্যেও ব্যাপ্তি লাভ করে। নূতন ধর্মের নাম হইল কুড়ুখ ধরম, কারণ উরাঁও জাতির অপর নাম কুড়ুখ।

উরাঁওদের বিশ্বাস, মুণ্ডা জাতির সংস্পর্শে আসিবার পূর্বে তাহাদের মধ্যে যে শুদ্ধ ধর্ম প্রবর্তিত ছিল, ইহা সেই ধর্ম। কুড়ুখ ধর্ম আশ্রয় করিয়া ভক্তগণ অতিশয় শুদ্ধাচারী হইয়া উঠিল। এমনকি স্থানবিশেষে চাষ ছাড়িয়া দিয়া তাহারা জমিদারের নিকট জমির ইস্তফা দিল। ইহাতে স্বভাবত জমিদার এবং মহাজনশ্রেণী আতঙ্কিত হইয়া পুলিসের সহায়তায় অন্দোলনকে দমন করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু টানা ভগৎগণ কাহারও সহিত বিরোধে লিপ্ত হইত না। প্রতি গ্রামে, স্বীয় সমাজে, যাহা কিছু অশুদ্ধ বা অকল্যাণকর বলিয়া মনে হইত, তাহা 'টানিয়া

ফেলিয়া দিবার জন্য সমবেতভাবে কীর্তন করিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিত। এইজন্য কুড়ুখ ধর্মাবলম্বীদের নাম টানা ভগৎ হয়।

টানা ভগৎ আন্দোলনের বিস্তারিত ইতিহাস শরৎচন্দ্রের উরাঁও ধর্ম ও আচার সম্পর্কে লিখিত পুস্তকে পাওয়া যায়। অমঙ্গল দূর করিবার জন্য কি ধরণের কীর্তন করা হইত তাহার একটি উদাহরণ, অনুবাদসহ নীচে দেওয়া হইল। কীর্তনটি স্থানীয় হিন্দী ভাষায় রচিত।

টানা বাবা টানা ভূতানিকে টানা
টানা বাবা টানা টান টোন টানা
টানা বাবা টানা কোণা-কুচি ভূতানিকে টানা
টানা বাবা টানা টান টোন টানা
টানা বাবা টানা লুকাল ছাপল ভূতানিকে টানা
টানা বাবা টানা টান টোন টানা
টানা বাবা টানা গাঢ়া ঢিপা ভূতানিকে টানা
টানা বাবা টানা টান টোন টানা
টানা বাবা টানা পেসল পাসল ভূতানিকে টানা
টানা বাবা টানা টান টোন টানা
টানা বাবা টানা ডাইনি ভূতানিকে টানা
টানা বাবা টানা টান টোন টানা
চন্দ্র বাবা সুরজ বাবা
ধরতি বাবা তারেগণ বাবা
টানা বাবা টানা টান টোন টানা
নামসে অরজি মাঙ্গতে হ্যঁয়
টানা বাবা টানা টান টোন টানা
ডাইনিকে নাসল যাপল ভূতানিকে টানা
টানা বাবা টানা টান টোন টানা
বাপাকে মানল দেওয়া ভূতানিকে টানা
টানা বাবা টানা টান টোন টানা
আজ্ঞা পর আজ্ঞা মানল দেওয়া ভূতানিকে টানা
টানা বাবা টানা টান টোন টানা

মুরগি-খাইয়া ভূতানিকে টানা
টানা বাবা টানা টান টোন টানা
কাড়া-খাইয়া ভূতানিকে টানা
টানা বাবা টানা টান টোন টানা
ভেড়া-খাইয়া ভূতানিকে টানা
টানা বাবা টানা টান টোন টানা
আদমি-খাইয়া ভূতানিকে টানা
টানা বাবা টানা টান টোন টানা

টানো বাবা টানো ভূতেদের টানো, টানো বাবা টানো টান টোন টানো। টানো বাবা টানো কোণা-ঘুঁজির ভূতেদের টানো, টানো বাবা টানো টান টোন টানো। টানো বাবা টানো, লুকিয়ে চুরিয়ে যে সব ভূত আছে তাদের টানো, টানো বাবা টানো টান টোন টানো। টানো বাবা টানো গাড়া ঢিপির ভূতেদের টানো, টানো বাবা টানো টান টোন টানো। টানো বাবা টানো খুনকরা লোকেদের ভূতকে টানো, টানো বাবা টানো টান টোন টানো। টানো বাবা টানো ডাইনীদের (অধীন) ভূতেদের টানো, টানো বাবা টানো টান টোন টানো। চন্দ্র বাবা, সূর্য বাবা, ধরিত্রী বাবা, তারাগণ বাবা, নাম ধরিয়া নিবেদন করিতেছি—টানো বাবা টানো টান টোন টানো। ডাইনীরা যে সব ভূতকে (নষ্ট বা স্থাপিত করিয়াছে) তাহাদের টানো, টানো বাবা টানো টান টোন টানো। (আমাদের) বাপেরা যেসব ভূতের কাছে মানত করিত তাদের টানো। টানো বাবা টানো টান টোন টানো। ঠাকুরদাদা এবং পোঠাকুরদাদা যে সব ভূতের কাছে মানত করিত তাদের টানো, টানো বাবা টানো টান টোন টানো। মুরগি-খেকো (যেসব দেবতার কাছে মোরগ বলি দেওয়া হয়) ভূতেদের টানো, টানো বাবা টানো টান টোন টানো। মহিষখেকো ভূতেদের টানো, টানো বাবা টানো টান টোন টানো। ভেড়াখেকো ভূতেদের টানো, টানো বাবা টানো টান টোন টানো। মানুষখেকো ভূতেদের টানো, টানো বাবা টানো টান টোন টানো।

১৯১৪-১৫ সালে যখন মহাসমর চলিতেছিল তখন চন্দ্র সূর্য প্রভৃতি দেবতার সঙ্গে মাঝে মাঝে জার্মান বাবার নিকটেও উরাঁওদের প্রার্থনা পৌঁছিত। তেমনই আবার ভূতপ্রেতের মত অপর যে সকল বস্তুকে উরাঁওগণ জাতির পক্ষে অনিষ্টকর বলিয়া বিবেচনা করিত,

সেগুলিকে উৎখাত করিবার জন্যও তাহাদের নিবেদনের অন্ত ছিল না। এইরূপ কয়েকটি পদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,

টানা বাবা টানা অগ্নিবোটকে টানা
টানা বাবা টানা রেলগাড়িকে টানা
টানা বাবা টানা বাইসিকিলকে টানা
টানা বাবা টানা

জাতীয় প্রাচীন সংস্কৃতির মধ্যে ব্রাহ্মণদের চোখে যাহা কিছু হেয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, তাহাই উৎপাটনের জন্য টানারা চেষ্টা করিতে লাগিল। ফলে বিধবা-বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, যুবক-যুবতীর অবাধ মেলামেশা, নাচ, গান, উৎসব আনন্দ, রঙ্গিন কাপড় পরা, কাপড়ের পাড়ে কাজ করা, ইত্যাদির উপরে আক্রোশ ভূতপ্রেতের উপর আক্রোশের মতই ধাবিত হইল। এই বিষয়ে উরাঁও ভাষায় রচিত শিক্ষামালার এক দীর্ঘ অনুবাদ নীচে দেওয়া হইল। পাঠক বহুস্থানে পুনরুক্তি দেখিয়া বিরক্ত হইতে পারেন, কিন্তু উরাঁও জাতির চিন্তাধারা কেমন তাহার সম্যক্ পরিচয় লাভের জন্য কিছু ধৈর্যের প্রয়োজন। অনুবাদটি পড়িলে উরাঁও-সংস্কৃতির প্রাচীন বা প্রচলিত রূপের সম্বন্ধেও যথেষ্ট ধারণা জন্মিবে। উরাঁও টানা ভগৎগণের বিশ্বাস যে নিম্নের কথোপকথন বা পূর্বোদ্ধৃত সঙ্গীতের মধ্যে কিছুই মানুষের রচনা নয়, ঈশ্বরপ্রেরিত শব্দ।

হে ঈশ্বর, তুমি আমাদের পিতা, বল প্রাণীহত্যা করিব কিনা?—না। মাংস, মাছ কাঁকড়া খাইব কিনা?—না। পাখির মাংস, মোরগ, শূকর, ছাগী বা ছাগের মাংস খাইব কিনা?—না। তবে জীবহত্যা একেবারে বারণ?—জ্ঞানত জীবহত্যা একেবারে বারণ। হে বাবা, ভূতপ্রেত থাকিবে কিনা?—থাকিবে না, পলাইয়া গিয়াছে। হে বাবা, ডাইন ডাইনী থাকিবে কিনা?—থাকিবে না, পলাইয়া গিয়াছে। হে বাবা, ওঝার বিদ্যা থাকিবে কিনা?—না, পলাইয়া গিয়াছে। হে বাবা, পচুই ও মদ খাইব কিনা?—না, খাইলে 'নরককুণ্ডে' যাইবে। হে বাবা, আখড়া (=গ্রামে নাচের জায়গা) ও ঝাকড়া (=গ্রামের পুরানো বৃক্ষসমষ্টি, যেখানে গ্রামদেবতার অধিষ্ঠান=মুণ্ডাদের সারনা) থাকিবে কিনা?—না, শেষ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। হে বাবা, কোনও পরব থাকিবে কিনা?—না, থাকিবে না, চলিয়া গিয়াছে। হে বাবা,

যাত্রানাচ ও শিকারের উৎসব থাকিবে কিনা?—না, থাকিবে না, শেষ হইয়া গিয়াছে।

করম, জিতিয়া, দশহরা, সোহরাই, দেওঠান, জাদুরা, ফাগুয়া খাড্ডি পরব; সব রকম নাচ; বাজনা বাজানো, যথা মাদল, নাগরা, ঝাঁঝ চামর, টোটা, টুররা, মাথায় পাগড়ি, রঙিন নেঙটি, কোমরবন্ধ; গহনার মধ্যে চাঁদোয়া, পুঁথি, হাঁসুলি, বালা, সোইঙ্কো, ঘুঙুর; ছেলে বা মেয়েদের ধুমকুড়িয়াতে (=মুণ্ডাদের গিতি-ওড়া) শয়ন, যুবকযুবতীদের অবাধ মেলামেশা, পরস্পরকে ধরা, হাত ধরাধরি করা, অন্যায় সহবাস; (কাপড়ের পাড়ে কাজ করা, হাতের বালা, কসুটি বালা, হাত বা পায়ের আঙুলে আংটি পরা, কানের দুল, উল্কি পরা, কান বিঁধানো, কানে বড় মাকড়ি পরা বা নাকে গহনা পরা, কানের ফুটাতে কাঠি গোঁজা, ঝিকাচিল্পি ও মুদ্রি নামে গহনা পরা; সেঙগাৎ বা মিতালি পাতানো; কলিযুগে যেরূপ বিবাহরীতির চলন আছে; মদ তৈয়ারি করা; পিতৃপুরুষের উদ্দেশে জলতর্পণ করা; বিবাহের ভোজে মোরগ বা শূকর মারা, মদ খাওয়া শূকরের মাংস রাঁধা, মদ ছাঁকা, মদ অপরকে খাইতে দেওয়া; বিবাহ অনুষ্ঠানে দুই বৈবাহিকের পরস্পরকে চুম্বন, পরস্পরের কাঁধে চড়া পরস্পরকে আলিঙ্গন করা, উভয়ে একত্র পচুই-এর তলানি ভাতের ডেলা খাওয়া; শূকরের মাংস পরিবেশন করা, বিবাহে ঢুলি নিয়োগ করা, বিবাহে গান গাওয়া বা আনুষ্ঠানিকভাবে ক্রন্দন করা, সিঁদুর দেওয়া, [illegible] দাণ্ডা-কাট্টা অনুষ্ঠান—এই সমস্ত খারাপ রীতি নিষিদ্ধ হইল।

বল বাবা, এই সকল খারাপ রীতি নিষিদ্ধ হইল কিনা?—হাঁ, নিষিদ্ধ হইল। বল, পুরাতন রীতি অনুযায়ী আখড়া এবং ঝাকড়া থাকিবে কিনা আমরা করম, জিতিয়া, দসহরা, সোহরাই উৎসবে; পূর্বের মত বিবাহ উপলক্ষে অথবা জাদুর, সরহুল, ফাগুয়া এবং খাড়িয়া নাচ করিতে পারিব কিনা?—না, থাকিবে না। করম নাচ থাকিবে কিনা?—না। আখড়া যাওয়া চলিবে কিনা?—না। অনিয়মিত সহবাস চলিবে কিনা?—না। যুবক-যুবতীর অবাধ মেলামেশা চলিবে কিনা?—না। মাদল, নাগরা, ঢাক বাজানো চলিবে কিনা?—না।

গোবর কুড়ানো, মাছ ও কাঁকড়া ধরা, (এখনকার মত) অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে ইঁদুর ধরা, ইঁদুর মাছ পাখি পোড়াইয়া খাওয়া বারণ। কাহারও সঙ্গে ঝগড়া করা বারণ। অগ্রহায়ণ পৌষ মাঘ ফাল্গুন মাসে গোবর কুড়াইতে

গিয়া উঁচু নীচু জমির আড়ালে (চালছোলা) ভাজা লইয়া যুবকযুবতীতে লুকাইয়া যেমনভাবে শয়ন করে, তাহা বারণ। বালকবালিকার পক্ষে 'সভাপতি' (নামক) ভূত বা অন্য ভূতের পূজা বারণ। মৃতের নামে জল উৎসর্গ বারণ। মুআ, মালেচ, দারহা, দেশওয়ালি ভূতের নামে পূজাপাঠ বারণ। মোরগ বলি, বলি দেওয়ার জন্য ছুরিতে শান দেওয়া; মহিষ বলি, শূকর বলি, বলি দেওয়ার জন্য টাঙ্গিতে শান দেওয়া; ভেড়া বা ষাঁড়কে মারিতে মারিতে বলি দেওয়া; মৃতের নাম স্মরণ করা; মদ খাওয়া, পচুই খাওয়া, পচুইএর জন্য বাখর তৈয়ারি করা, বাখর কেনা, মদ চোলাই করা, মদের দোকানে যাওয়া, পচুই খাওয়া, মদ খাওয়া; কোন মানুষের সঙ্গে বিবাদ করা, অপরের দ্রব্যে লোভ করা—সব বারণ।

আগে উরাঁও সমাজে যেসকল উৎসব হইত, যেমন পৌষ পরব, মাঘ পরব ফাগু পরব, চৈত পরব, জাদুরা নাচ, মাঘ-পূর্ণিমার নাচ, (মাঘ-পূর্ণিমায় ধুমকুড়িয়ার প্রধান নির্বাচনের জন্য) কান্তিপূজার পাথর চালানো, গাঁয়ের মাহাতো এবং নায়েগা নির্বাচনের জন্য ঝাকড়া-বাসী দেবীর নামে পাথর চালানো; পূজার জন্য চাল রাখা বারণ; মোরগকে বলি দিবার পূর্বে খাওয়ানো বারণ; জোঙথ চান্ডী ও পাচগী চান্ডী শিকার করা বারণ, দান্ডা-কাট্টা বারণ, সিঁদুর দান বারণ, (ছেলেদের নামকরণের সময়ে) অম-খরনা অনুষ্ঠান বারণ, যুবকমধ্যে সেঙ্গাৎ বা মিতালি বারণ, মোরগ বা ছাগবলি বারণ; সুরি করা (ভাত ও মাংস একত্র রাঁধিয়া পূজার নৈবেদ্য) বারণ, সুরি পরিবেষণ করা বারণ।

নাচের জায়গা সাজানো বারণ; স্ত্রীপুরুষের নাচ বারণ।

টানা ভগৎগণের কীর্তন বা প্রার্থনা কিন্তু শুধু নৈতিমূলক নহে; কোন কোন গানে উচ্চাঙ্গের ভাবও পাওয়া যায়। সেইরূপ একটি গানের অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল।

এসো, বাবা ঈশ্বর, আমাদের আঙিনায় এসো, আমাদের দুয়ারে এসো। হে ভাই, 'বাবা' 'বাবা' বলিয়া তোমরা ডাক, কিন্তু বাবা আমাদের কায়ার মধ্যে, আমাদের জিয়ার (=হৃদয়ের) মধ্যে। হে ভাই, কারুর সঙ্গে কলহ করিও না, [কারণ] বাবা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আছেন। 'বাবা' 'বাবা' বলিয়া চিৎকার করা [বৃথা], [কেননা] বাবা আছেন আমাদের হৃদয়ের মধ্যে। পথে কাহাকেও গালি দিও না, [কেননা] বাবা আছেন আমাদের হৃদয়ের

মধ্যে। বাবা আমাদের কায়ার মধ্যে বাস করেন, পরস্পরকে পথে বা গলিতে গালি দিও না। বাবার প্রিয় হইয়া, মায়ের প্রিয় হইয়া, হাতে ছোট ঝুড়ি ধরিয়া (=?) পরস্পরের সঙ্গে [প্রেমে] সংযুক্ত হও। কাকার প্রিয় হইয়া, কাকীর প্রিয় হইয়া, হাতের ছোট ঝুড়ি ধরিয়া পরস্পরের সঙ্গে [প্রেমে] এক হও।

টানা ধর্মের মত নীতিপ্রধান ও শুচিবায়ুগ্রস্ত ধর্ম উরাঁও জাতির মধ্যে প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করার ফলে তাহাদের জাতীয় জীবনে বহুবিধ পরিবর্তন দেখা দিল। টানা ভগৎগণ সামাজিক সমস্ত সংস্কারগুলিকে পরিবর্তিত ও শোধিত করিয়া লয়। অপর জাতির, অর্থাৎ প্রধানত জমিদার এবং মহাজনের শোষণ হইতেও তাহারা বাঁচিবার চেষ্টা করিতে থাকে। এক সময়ে শিবু ভগৎ নামে এক ব্যক্তি (১৯২০ সালে) বহু টানা ভগৎকে লইয়া চাষের হাল বলদ সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া হাজারিবাগ জেলায় সাত-পাহাড়ী পর্বতমালার অভিমুখে রওনা হয়। তাহার বিশ্বাস ছিল সেখানে মুক্তিদাতা ঈশ্বরের সাক্ষাৎ মিলিবে এবং তাহার পর উরাঁও-জীবনে আর কোনও দুঃখ থাকিবে না।

শরৎচন্দ্র অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, টানা ভগৎ আন্দোলন আপাতত ধর্মমূলক মনে হইলেও ইহার গোড়ায় ছিল উরাঁওদের দুর্বহ দারিদ্র্যবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা। ভ্রান্ত পথ অনুসরণ করার ফলে যখন সে মুক্তির আস্বাদ মিলিল না, তখন কুড়ুখ-ধর্মের প্রভাবও দেখিতে দেখিতে রাঁচি, হাজারিবাগ জেলা হইতে মিলাইয়া গেল।

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্ট ধারণা জন্মিবে যে, জুয়াঙ্গ অথবা পাউড়ি ভুইঞাদের উপর আর্য বা ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার যে প্রভাব পড়িয়াছে মুণ্ডা অথবা উরাঁওদের ক্ষেত্রে তাহা পরিমাণে এবং গভীরতায় আরও বেশি। জুয়াঙ্গ, শবর অথবা মুণ্ডা, উরাঁও জাতিবৃন্দ কিন্তু অরণ্যের ছায় পরিত্যাগ করিয়া কয়েক শতাব্দী মাত্র অপরাপর জাতির সহিত অর্থ

নৈতিক বা সংস্কৃতিগত বন্ধনে সংযুক্ত হইয়াছে। তাহাদের ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য আজও বজায় রহিয়াছে এবং লোকাচার বা দেশাচারের কোন কোন অংশ স্পষ্টত পূর্বাবস্থার স্মৃতি বহন করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণশাসিত আর্যসমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, অপর জাতিকে বর্ণাশ্রমের মধ্যে স্থান দিবার প্রক্রিয়া বহু শতাব্দী হইতে ভারতবর্ষে চলিয়া আসিতেছে; এবং তাহার ফলে অনেকে প্রায় নিজের স্বতন্ত্র সত্তা বিসর্জন দিয়া বৃহত্তর হিন্দুসমাজকে পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে জীবনের পরিধি ব্যাপ্ত হওয়ার ফলে তাহারা নিজেও অনেকাংশে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে।

সেইরূপ কয়েকটি জাতির বিষয়ে আলোচনা করিলে আমরা আর্য-সভ্যতার প্রকৃতি এবং আদর্শ সম্বন্ধে আরও জ্ঞান আহরণের সুযোগ লাভ করিব।

চতুর্থ অধ্যায়

কলু বা তেলীদের কথা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে হিটলার যে সময়ে জার্মান জাতির উৎপাদনব্যবস্থাকে সামরিক প্রয়োজনে সম্পূর্ণ নূতনভাবে ঢালিয়া সাজিতেছিলেন, তখন তাঁহার একটি লক্ষ্য ছিল, জার্মানরাষ্ট্রের সীমা-রেখার মধ্যেই যেন যথাসম্ভব অধিক পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপাদন করা যায়। সেই সময়ে জার্মানির বৈজ্ঞানিকগণ বহুবিধ গবেষণায় লিপ্ত থাকিয়া লোকশিক্ষার জন্য নানাবিধ পুস্তিকাদি প্রচার করেন। তাহার কিছু বিবরণ জি ডি এইচ কোল প্রণীত 'প্র্যাক্‌টিক্যাল ইকনমিক্স' নামক এক গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছিল। একখণ্ড পুস্তিকায় জার্মান জাতিকে অন্যবিধ মাংসের পরিবর্তে মাছ এবং খরগোশের মাংস বেশি করিয়া খাইতে বলা হয়; কারণ খরগোশের বংশ অতি দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং সমুদ্র বা নদী হইতে মাছ আসে বলিয়া তাহার জন্য স্বতন্ত্র কোনো জমি আটকাইয়া রাখিতে হয় না। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কোনো জমিতে গোরুর খাদ্য উৎপাদন করিয়া যদি গোমাংস আহার করা যায়, তবে বিঘা-পিছু জমি হইতে যত ক্যালরি-মূল্যের খাদ্য উৎপন্ন হয়, সেই জমিতে গম বুনিলে তদপেক্ষা দশগুণ এবং আলু বুনিলে বিশগুণ ক্যালরি উৎপাদনকারী খাদ্যদ্রব্য লাভ করা সম্ভব হয়। মাখনজাতীয় খাদ্যের জন্য দুধ অথবা জান্তব চর্বি অপেক্ষা তৈলজাতীয় খাদ্যশস্যের চাষে তেমনই বেশি লাভ আছে; অর্থাৎ অল্প পরিমাণ জমিতে বহু লোকের উপযুক্ত তৈলের উৎপাদন ব্যবস্থা করা সম্ভব। সেই জন্য জার্মানিতে সয়াবীন নামক শস্যের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়; অর্থাৎ জান্তব খাদ্যের অভাব নিরামিষ প্রোটিন ও তৈলের সহায়তায় অনেকাংশে মেটানো হয়।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ সামরিক প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া, অল্প ভূমিখণ্ডে বহু মানুষের খাদ্যসংস্থানের

চেষ্টায় যে তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, চীন এবং ভারতবর্ষের মানুষ বহু যুগের অভিজ্ঞতার ফলে তাহারই কাছাকাছি পোঁছিয়াছিল। এই দুই দেশে যেরূপ ঘন বসতি আছে, তাহা জগতের মধ্যে দুর্লভ। ইংলণ্ড জার্মানি প্রভৃতি শিল্পপ্রধান দেশে মানুষের বসতি খুব ঘন বটে; কিন্তু সেখানকার মানুষ বহু দূরে পর্যন্ত বাহু প্রসারিত করিয়া খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে। সেই সকল ভূখণ্ড সুদ্ধ হিসাবে আনিলে দেখা যায়, ইউরোপীয় উৎপাদনব্যবস্থায় আজ প্রতি বর্গ মাইল জমি হইতে মানুষের জীবন-ধারণোপযোগী যত খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইতেছে, চীন অথবা ভারতবর্ষ তদপেক্ষা বেশি লোকের প্রাণধারণের জন্য সামগ্রী যোগাইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই দুই দেশে উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণার অভাবে, অথবা নানা কারণে চাষের অবনতি ঘটায়, প্রতি বর্গ মাইলে বহু লোকের উপযোগী দ্রব্য উৎপন্ন হইলেও, লোকের সুখ নাই। প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া তাহারা কোনো রকমে প্রাণধারণ করিয়া থাকে। হয়তো বিজ্ঞানের যথোচিত প্রয়োগ করিলে মানুষের শ্রমের ভার আরও কমানো সম্ভব হয়, অথবা একই পরিশ্রমের দ্বারা ভোগের মাত্রা আরও বাড়ানো যায়।

সে কথা বাদ দিলেও আমরা দেখি, চীন জাপান যবদ্বীপ শ্যাম ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষ প্রভৃতি যে সকল দেশে বহু মানুষের বাস, সেখানে মানুষ চালানি খাদ্যশস্যের উপরে নির্ভর না করিয়া স্থানীয় উৎপাদনের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকে। বহুকাল হইতে এই সকল দেশে প্রোটিন এবং চর্বিজাতীয় খাদ্যের জন্য নানাবিধ ডাল কলাই বাদাম এবং বিভিন্ন তৈলবীজের মধ্যে তিল চীনাবাদাম সরিষা সরগুজা তিসি নারিকেল সয়াবীন প্রভৃতি বুনিয়া আসিতেছে। জান্তব খাদ্যের মধ্যেও গোরু বা মহিষের মাংসের পরিবর্তে তাহারা দুধ অথবা দুগ্ধজাত বিভিন্ন দ্রব্য এবং ছাগল হাঁস শূকর ও মাছের দিকেই বেশি ঝুঁকিয়াছে। কারণ এইসকল জীবজন্তু সহজে বৃদ্ধি পায় অথবা ইহাদের জন্য খুব বেশি যত্নের প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ, যুদ্ধের চাপে জার্মানি যে পথ ধরিতে বাধ্য হইয়াছিল, এশিয়ার পূর্বাঞ্চলে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মানুষ সেই একই পথ বহুকাল পূর্বে গ্রহণ করিয়াছে, ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

ভারতবর্ষে তেলের ব্যবহার এবং তেলী জাতির বিবরণ

যাহাই হউক, উপরোক্ত খাদ্যোৎপাদনের ব্যবস্থা বহুদিন হইতে ভারতবর্ষে চলিয়া আসিতেছে, ইহা বলাই আমার অভিপ্রায়। যদি কোনো শিল্প এক বিস্তীর্ণ দেশ ব্যাপিয়া চলিতে থাকে, তবে কালবশে সেই দেশের বিভিন্ন অংশে শিল্পের সম্বন্ধে কিছু কিছু পার্থক্য দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। ভারতবর্ষের মধ্যে তেল বাহির করিবার যন্ত্রের মধ্যে এইরূপে কি কি প্রভেদ দেখা দিয়াছে, সে বিষয়ে আলোচনা করিলে আমরা অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান পাই।

ভারতবর্ষের মধ্যে আসাম বাঙলা উড়িষ্যা মাদ্রাজ বোম্বাই অঞ্চলে তেলের ব্যবহার বেশি; কিন্তু স্থানভেদে বিভিন্ন তৈলের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। কোথাও সরিষা, কোথাও তিল, কোথাও চীনাবাদাম, কোথাও নারিকেল, কোথাও বা তিসির তেলের চলন আছে। বিহারপ্রদেশ হইতে আমরা যত উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হই, ততই তেল এবং সঙ্গে সঙ্গে মাছেরও ব্যবহার দ্রুত কমিয়া আসে; তৎপরিবর্তে ঘি এবং দুধের চলন বৃদ্ধি পায়। একেবারে কাশ্মীর রাজ্যে পৌঁছিলে আবার মাছ ও তিসির তেলের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বিভিন্ন অঞ্চলে তেলের ব্যবহার তুলনা করিলে মনে হয়, পঞ্জাব রাজপুতানা যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে উত্তরকালে যে সংস্কৃতির প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছিল, তাহার মধ্যে মাছ এবং তেলের ব্যবহার ছিল না। তেল বোধ হয় পূর্বতন ভারতীয় সংস্কৃতির এক বিশেষ উপাদান এবং লক্ষণ ছিল; এবং সেই কারণে উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষ বাদ দিলে অবশিষ্ট অংশে ইহার ব্যাপক ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষে যেসকল প্রদেশ তৈলপ্রধান, সেখানে তৈল নিষ্কাশনের জন্য নানাবিধ কৌশল ও নানাপ্রকার যন্ত্রের চলন আছে। কোল-সংস্কৃতির আলোচনাকালে আমরা কাঠের দুইখণ্ড পাটার সাহায্যে চাপিয়া তেল বাহির করার এক রীতির বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছিলাম। কোলদের মধ্যে ইহাও দেখা গিয়াছিল যে, ঘানির সাহায্যে তেল বাহির করিবার সময়ে নিকটে তেলী না থাকিলে তাহারা নিজেই ঘানি চালায়

বটে; কিন্তু পাছে জাত যায়, এই ভয়ে ঘানিতে বলদ না জুতিয়া নিজেরাই ঘানি ঘুরাইয়া থাকে। তেলী জাতি হিন্দুসমাজে অজলচল ছোট জাতি বলিয়া গণ্য; সেইজন্য জাতিনাশের ভয়ে অথবা পতিত হইবার আশঙ্কায় অপরে তাহাদের বৃত্তি কিছুতে গ্রহণ করিতে চায় না।

কিন্তু সামান্য অনুসন্ধান করিলেই টের পাওয়া যায় যে, বাঙলা উড়িষ্যা বিহার প্রভৃতি প্রদেশে তেলীদের সামাজিক পদ সর্বত্র সমান নহে। উড়িষ্যার উত্তরভাগে সড়ইকলা নামে এক ক্ষুদ্র রাজ্য আছে। সেখানে পূর্ব দিক হইতে বাঙলাভাষা, পশ্চিম দিক হইতে বিহারী এবং দক্ষিণ দিক হইতে উড়িয়াভাষা আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে। তৈল নিষ্কাশনের ঘানিও সড়ইকলাতে তিন রকমের প্রচলিত রহিয়াছে।

১। দুইটি বলদে টানা, নালিবিহীন, একখণ্ড কাঠের ঘানি;

২। এক বলদে টানা, নালিযুক্ত, একখণ্ড কাঠের ঘানি;

৩। এক বলদে টানা, নালিযুক্ত; কিন্তু দুইখণ্ড কাঠে নির্মিত পিঁড়িবিশিষ্ট ঘানি।

প্রথম ঘানি গাছটি একখণ্ড শালকাঠে তৈয়ারি। ইহা ভূমির উপরে প্রায় দেড় হাত ও নীচে তিন চার হাত বা আরও বেশি পোঁতা থাকে। ঘানিগাছের মাথায় যে খোল কাটা থাকে, তাহা কতকটা কলসীর ভিতরের মত। ইহাঁ তেলী স্বয়ং কাটিয়া লয়, ছুতারের সাহায্য গ্রহণ করে না। অনেকদিন কাজ হইলে উপরের অংশ ক্ষইয়া যায়, তখন একটু কাটিয়া ফেলিয়া আবার নূতন খোল নির্মাণ করিয়া লইতে হয়।

যন্ত্রের নাম ঘনা। যে দণ্ডের দ্বারা বীজ পেষা হয় তাহার নাম লাঠি। যে পাটায় বলদ দুইটি জোতা থাকে তাহাকে পাঁজরি বলে। পাঁজরির সহিত বাঁশপাতি নামক অপর একখণ্ড কাঠ জোড়া থাকে, তাহার বাঁকা মুখের নাম মগরমুহি। পাঁজরিতে ইসের সাহায্যে জোয়াল বাঁধা হয়। পাঁজরির উপরে খাড়া মালকুম দণ্ড, তাহাতে দুই তিনটি ছিদ্র থাকে। মালকুমের উপরিভাগের সহিত বাঁকিয়া নামে একটি বাঁকা কাঠ থাকে, তাহার মধ্যে একটি খোপে লাঠির উপরাংশ বসিয়া যায়। আলগা উপকরণের মধ্যে শাবল, ইহার মুখ ঈষৎ বাঁকা। তাহার সাহায্যে খইল কুরিয়া তুলিবার সুবিধা হয়। আর কাঠি নামক একখণ্ড কাঠে কিছু

ময়লা ন্যাকড়া ফালির মত বাঁধা থাকে; তাহার সাহায্যে ঘানির গর্ভ হইতে তেল শুষিয়া বাহির করা হয়।

বীজগুলিতে প্রথমে ঈষৎ জল মাখাইয়া ঘানিতে দেওয়া হয়। পাঁজরির উপরে ভারি পাথর চাপানো হয়; যে চালায় সেও ইহার উপরে দাঁড়াইয়া বলদ হাঁকাইতে থাকে। কিছুক্ষণ পেষার পর তেল জমিলে, শাবলের সাহায্যে খইলের উপরাংশ ভাঙিয়া কাঠির ন্যাকড়ার সাহায্যে তুলিবার পর, সেই তেল চুঁচিয়া একটি ভাঁড়ে সংগ্রহ করা হয়।

যে তেলীরা দুই বলদের ঘানি চালায়, তাহারা বলে যে ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবে তাহাদের জল গ্রহণ করে; কথাটা ঠিক নয় বলিয়াই আমার মনে হইয়াছে। যাহাই হউক, ইহাদের জাতির নাম তেলী, পদবী পড়িহারি। ইহারা ঘানিতে কখনও এক বলদ জোতে না, বলদের চোখে ঠুলি দেয় না, ঘানিতেও ছিদ্র করে না।

দ্বিতীয় ঘানিগাছ মাটির উপরে দেড় হাত বাহির হইয়া থাকে, নীচে দুই হাত পোঁতা। উপরে প্রথম ঘানির মত খোল কাটা থাকে, তাহার নীচের দিকে একটি গর্ত দিয়া নালির পথে তেল চুয়াইয়া বাহির হয়।

ঘানির নাম ঘানা। যে নালিপথে তেল বাহির হয় তাহার নাম নেরিও। নীচে গাড়ু থাকে। পেষণদণ্ডের নাম লাঠিম। কাঠের পাটা মাটি হইতে উপরে থাকে, ইহাকে কাতের বলে। কাতেরে সংলগ্ন খাড়া কাষ্ঠদণ্ডের নাম সংগ্রহ করিতে ভুল হইয়াছিল; তাহাতে বাঁধা বাঁকা কাঠের নাম ঢেঁকা। ঢেঁকায় দুই তিনটি খোপ কাটা থাকে। তাহার মধ্যে লাঠিমের উপরাংশ প্রবিষ্ট করানো হয়। লাঠিমের সহিত আলগা-ভাবে যুক্ত জোয়াল। ইহার সহিত আড়াআড়ি একটি কাঠি কাতেরের শেষভাগের সহিত দড়ি দিয়া বাঁধা থাকে। এই কাঠির নাম গলি। কাতেরে চালক পা ঝুলাইয়া বসিয়া থাকে, ভারের জন্য পাথরের খণ্ডও চাপানো হয়।

সুরতাডি গ্রামে ধনু গোরাঁইএর বাড়িতে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাদের সহিত মাণিকবাজারের দুই বলদে চালানো ঘানির চালক পড়িহারিদের তফাৎ কি। উত্তরে এক বৃদ্ধা বলিল, 'উয়ারা দো-বলদিয়া, আমরা এক-বলদিয়া।' আরও শিখিলাম যে,
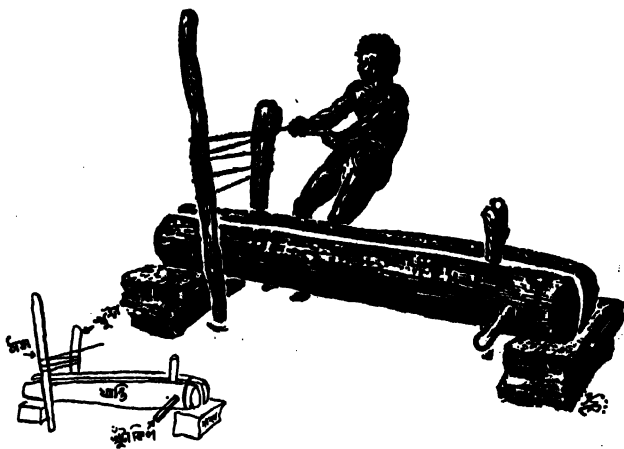
খাড়াভাবে রাখা কাঠের পাটায় নির্মিত ঘানি
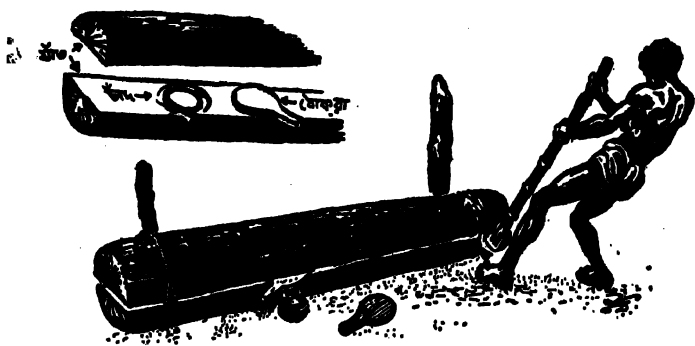
চিৎ করিয়া শোয়ানো দুইটি কাঠের পাটায় নির্মিত ঘানি

ভাদুয়া-গ্রামে কাঠের ঘাত-কুণ্ডি

এক-বলদে টানা নালিযন্ত্র একখণ্ড-কাঠের ঘানি
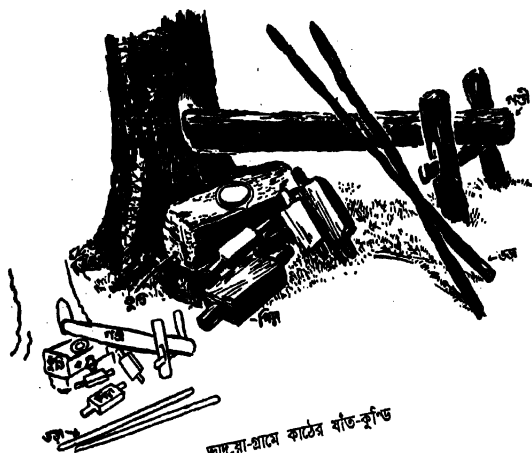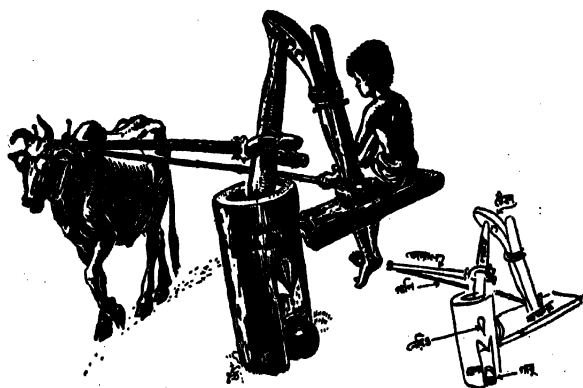
দুই-বলদে টানা নালিবিহীন কাঠের ঘানি
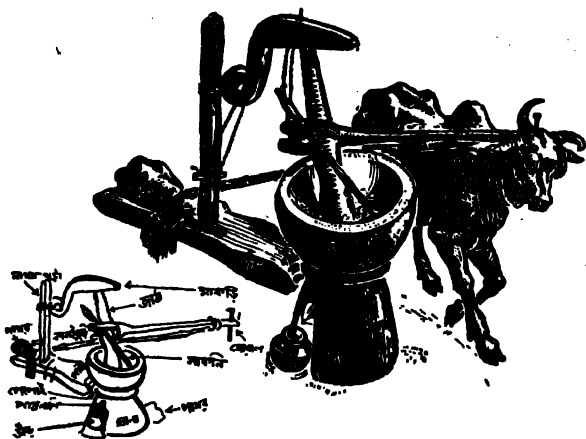
এক-বলদে টানা নালিযুক্ত পিঁড়ি-বিশিষ্ট ঘানি

তর্মাড়িয়া তেলীদের ঘানি
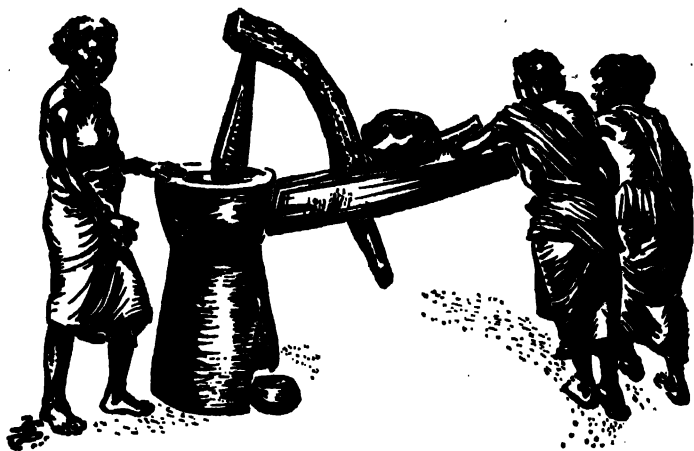
(ক) দো-বলদিয়াদের লাঠি লম্বা, একবলদিয়াদের ছোট, মাত্র দুই-হাত। তাই ইহারা ঘরের মধ্যে ঘানি চালাইতে পারে, দো-বলদিয়ারা পারে না। দো-বলদিয়ারা গোরুর চোখে ঠুলি বাঁধে না, ইহারা বাঁধে।

(খ) যে পাটায় চালক চাপিয়া বলদ হাঁকায় তাহা দো-বলদিয়াদের ক্ষেত্রে মাটিতে প্রায় ঠেকিয়া থাকে, এক-বলদিয়াদের বেলায় সম্ভব নয়, তাহা হইলে গাড়ু ভাঙিয়া যাইবে।

(গ) উভয় জাতির মধ্যে সাংগা অর্থাৎ বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে।

তৃতীয় যন্ত্রটিও এক বলদে টানে। যন্ত্রের নাম ঘানা। উপরে আলাদা কাঠে তৈয়ারি জামবাটির আকারের এক বৃহৎ অংশ থাকে, তাহার নাম পিঁড়ি। পেষণদণ্ডের নাম জাঠ। জাঠের উপরাংশে একটি সুদৃশ্য বাঁকা কাষ্ঠখণ্ড আটকানো থাকে, তাহার নাম মার্কাড়ি। মার্কাড়ির পিছনে ছিদ্র, তাহার ভিতর দিয়া দড়ি গলাইয়া মখমখুটার সংগে আটকানো থাকে। মখমখুটা পাটার উপরে খাড়া দাঁড়াইয়া থাকে। পাটার যে প্রান্ত ঘানার গায়ে ঘষিয়া যায় সেখানে গোলোই নামে একটি কাঠের টুকরা জোড়া থাকে। ঘানার নীচে যে স্থান দিয়া তেল বাহির হয় তাহার নাম পাৎনালি। তলায় ভাঁড়ে তেল জমে। ঘানির মধ্যে বীজকে নাড়িয়া দিবার জন্য একটি কাঠি আটকানো থাকে, তাহাও ঘোরে। ইহার নাম সাঁকনি। গোরুর চোখে চামড়ার ঠুলি থাকে। গোরুকে জুতিবার জন্য জোয়াল। জোয়াল পাটার সংগে একটি আড়াআড়িভাবে বাঁকা কাঠি দিয়া সংলগ্ন থাকে, তাহার নাম কাইনুড়ি।

তৃতীয় শ্রেণীর ঘানি যাহারা চালায়, সেই কলুদের মতে শালের চেয়ে অশ্বত্থ, বট বা নিম কাঠের ঘানিই ভাল হয়। অথচ এদেশে শালকাঠ সহজে পাওয়া যায় এবং অপর তেলী জাতি দুইটি শালের ঘানিই ব্যবহার করিয়া থাকে। হয়তো তৃতীয় শ্রেণীর কলুজাতি যে দেশ হইতে আসিয়াছিল, সেখানে শাল কাঠের অভাব থাকায় ইহাদের পছন্দ অন্য কাঠের উপরেই হইয়াছে।

নারাণপুর গ্রামে ঘাসিরাম গরাঁই এবং মহেশ্বর গরাঁই নামে দুইজন কলুর নিকট সুরতাডির গোরাঁইদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় নিম্নলিখিত সংবাদ পাওয়া গেল।

(ক) 'আমরা একাদশ তেলীর অন্তর্গত, জাতিতে কলু। এই গ্রামে দ্বাদশ তেলীর অন্তর্গত লোকও আছে; তবে তাহারা তেল পেষে না; ব্যবসা-বাণিজ্য করে। আমরা রাঢ়ী কলু অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর, কেননা আমাদের পূর্বপুরুষেরা দ্বিতীয় বিবাহ, অর্থাৎ বিধবা-বিবাহের চলন করিয়া গিয়াছিলেন।

(খ) 'মাণিকবাজারের দুই-বলদওলা তেলী এবং সুরতাডির এক-বলদওলা তেলীদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। উহারা উভয়েই উড়িষ্যা বিভাগের লোক। আমরা পূর্ববঙ্গের লোক [অর্থাৎ পূর্বদিকে অবস্থিত বঙ্গদেশের, বাঙলার পূর্বাঞ্চলের নয়]। এখানে তিন-চার পুরুষ বসবাস করিতেছি। শিখরভূম হইতে আসিয়াছিলাম। [শিখরভূম মানভূম জেলায় বরাহভূমের পূর্বদিকে অবস্থিত]।

(গ) 'সুরতাডির উহাদের সহিত আমাদের জল চলে না। উহারা কুঁকুড়া ও মদ খায়। উহারা বোধ হয় মগহিয়া।' [মগধ বা বিহার প্রদেশের লোক।]

কয়েকদিন পরে পুনরায় সুরতাডি গ্রামে এক-বলদিয়া তেলীর বাড়িতে উপস্থিত হইয়া নারাণপুরের কলুদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলাম। তখন ধনু গোরাঁই বলিল, 'নারাণপুরের বাঙালী শাহীর (বাঙালী পাড়ার) উআরা শিখ্‌রিয়া (শিখরভূমের অধিবাসী) বটে। উআদের ঘানিতে পিঁড়ি আছে, আমাদের নাই।'

তেলীদের সম্বন্ধে আলোচনা

এইবার সড়ইকলাতে প্রচলিত তিন প্রকার ঘানি কোথা হইতে আসিল তাহার সন্ধান লওয়া যাক। দো-বলদিয়া এবং এক-বলদিয়া তেলীর মধ্যে বিধবা-বিবাহের চলন আছে। তন্মধ্যে মদ ও মুরগির মাংস ব্যবহার করার জন্য এক-বলদিয়া গোরাঁই কিছু নিম্নশ্রেণীর। পিঁড়িবিশিষ্ট ঘানির চালক কলুরা অজলচল হইলেও মগহিয়াদের চেয়ে নিজেদের বড় বলিয়া মনে করে, কেননা তাহাদের মধ্যে মদ ও মুরগির চল নাই। তবে তাহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহের প্রথা বর্তমান থাকায় তাহারা রাঢ়ী শ্রেণীর তেলী এবং দ্বাদশ তেলী অপেক্ষা নিজেদের ছোট বলিয়া মনে করে।

ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে প্রচলিত ঘানির বর্ণনা ও বিভিন্ন অংশের নাম পাওয়া যায় না। তবে গ্রিয়ার্সন সাহেব 'বিহার পেজ্যাণ্ট লাইফ' নামক গ্রন্থে সেই প্রদেশের ঘানির যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়াছেন, তাহার সহিত সড়ইকলার এককাঠের, নালিযুক্ত ঘানির অনেক মিল আছে। এখানে যাহা ঘানা বিহারে তাহা কোল্হু। বিহারে ঘানি বা ঘানী বলিতে ততখানি তৈলবীজকে বুঝায় যাহা এক চড়ানে কোল্হুর মধ্যে পেষার জন্য দেওয়া হয়। ঘান বলিতে বিহারী ভাষায় উদুখলে বা যাঁতায় একবারে যত শস্য ধরে, অথবা কড়াতে যতখানি জিনিস চাপানো হয়, তাহাকেও বুঝায়। সড়ইকলার নেরিও বিহারে নিরোহ্ বা নারাহ। কাতের বিহারে কংরী নামে পরিচিত। লাঠিম কিন্তু বাঙলাদেশের মত জাঠ নাম ধরিয়াছে। এক-বলদিয়াদের ঢেঁকা বিহারে ঢেকা বা ঢেকুআ। গাড়ু কিন্তু ছনা। অর্থাৎ বিহারের সহিত তথাকথিত মগহিয়া তেলীদের ঘানির নাম অনেক মেলে, কিছু মেলে না।

শুনিয়াছি এককাঠে তৈয়ারি ঘানি পূর্ববঙ্গে নোয়াখালি অথবা শ্রীহট্ট প্রভৃতি জেলাতেও প্রচলিত আছে, তবে সেখানকার বিভিন্ন অংশের নাম সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

দুই-বলদের ছিদ্রহীন ঘানি পুরী জেলার মফস্বলে, গঞ্জাম জেলায় এবং অন্ধ্রদেশে প্রচলিত আছে। হুগলীর আরামবাগ মহকুমায় নাকি এইরূপ দু-একটি ঘানি এখনও চলে। মেদিনীপুর জেলার মধ্যে কাঁথি মহকুমার দক্ষিণভাগে এখন পর্যন্ত এই ঘানিই চলিয়া থাকে। গুজরাটের ঘানি এই ধরণেরই।

নারাণপুরের কলুরা স্পষ্টই নিজেদের বাঙালী বলিয়া পরিচয় দেয়। নদীয়া জেলা বা চব্বিশ পরগণায় পিঁড়িবিশিষ্ট ঘানিরই চলন। হুগলী, বর্ধমান, বীরভূমেও তাই। অন্যত্রও থাকিতে পারে, তবে সমগ্র ভারতবর্ষের শিল্পসরঞ্জামের খুঁটিনাটি বর্ণনা কেহ সংগ্রহ করেন নাই, তাই তুলনা বা ঐতিহাসিক তত্ত্ব আহরণে আমাদিগকে পদে পদে অসুবিধায় পড়িতে হয়।

সড়ইকলার তেলীদের সম্বন্ধে সামান্য অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেল যে, তেলী জাতি নানা শাখায় বিভক্ত। প্রত্যেকের ঘানিতে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে; তাহা ছাড়া খাওয়াদাওয়া, বৈবাহিক আচার-ব্যবহারের

মধ্যেও শাখায় শাখায় তারতম্য লক্ষিত হয়। বিভিন্ন শাখার ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, কেহ উড়িষ্যাবাসী, কেহ বিহারের সহিত সম্পর্কিত, কেহবা বাঙলাদেশ হইতে আসিয়াছে। প্রত্যেকে শিল্পকলার সম্বন্ধে স্বীয় বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া চলে এবং পরস্পরের সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হয় না। নিজের শাখার মধ্যে সর্ববিধ বৈবাহিক সম্পর্ক সঙ্কুচিত করিয়া রাখা, প্রতি জাতি বা উপজাতির সাধারণ লক্ষণ।

অথচ দুইটি এক-বলদিয়া ঘানির মধ্যে যে খুব বেশি প্রভেদ আছে, তাহাও নহে। পিঁড়িবিশিষ্ট ঘানি যদি পশ্চিমবঙ্গে আবদ্ধ থাকে এবং এককাঠের ঘানি একদিকে পূর্ববঙ্গ ও আসাম এবং অপরদিকে বিহারে বা আরও পশ্চিমে বিস্তৃত থাকে, তবে বলিতে হইবে যে, এককাঠের ছিদ্রযুক্ত ঘানি অপেক্ষাকৃত পুরাতন এবং পিঁড়িযুক্ত ঘানি পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত হইয়াছিল বলিয়া সর্বত্র তাহা এখনও ছড়াইয়া পড়ে নাই। দুই-বলদযুক্ত ছিদ্রহীন ঘানি এবং এক-বলদযুক্ত সছিদ্র ঘানি ভারতের ঠিক কোন্ কোন্ জেলায় প্রচলিত তাহা জানিতে পারিলে উভয়ের মধ্যে ঐতিহাসিক সম্পর্ক কি ছিল, তাহা আবিষ্কার করা সম্ভব হইবে।

তেলীদের মধ্যে শিল্পসরঞ্জামের রূপ ও ব্যবহার ভেদে এবং সামাজিক বা আহার সম্পর্কীয় প্রথার তারতম্য হেতু যে কয়েকটি উপজাতির সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা আমাদের পক্ষে লক্ষ্য করিবার মত বিষয়। হয়তো বিভিন্ন অঞ্চলে আবদ্ধ থাকার সময়ে শিল্পের উৎকর্ষ বা উচ্চ শ্রেণীর আহার বিহার বা সামাজিক প্রথা অনুকরণ করার ফলে এই সকল উপজাতি উদ্ভূত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা অযৌক্তিক হইবে না। উরাঁও এবং কোল সংস্কৃতির বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছিলাম যে, ব্রাহ্মণ্য শুদ্ধাচার গ্রহণ করার ফলে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি শাখার উদ্ভব ঘটিয়াছিল, কিন্তু সেসকল শাখার মধ্যে বৈবাহিক-সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় নাই; কেবল ক্ষেত্রবিশেষে, যেমন টানা-ভগৎদের বেলায়, তাহার উপক্রম দেখা গিয়াছিল। তেলী শ্রেণীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে কিন্তু সেরূপ বিবাহ-সম্পর্কের অভাব দেখা যায়।

অতএব ভারতবর্ষের সমাজে যাহারা জাতিভেদ মানিয়া চলে তাহাদের মধ্যে আহারবিহার বা সামাজিক রীতিনীতির মধ্যে কোনও

নূতন প্রথার প্রবর্তন ঘটিলে, অথবা শিল্পকৌশলে কোনও পরিবর্তন বা উৎকর্ষ সাধিত হইলে সঙ্গে সঙ্গে স্বতন্ত্র শাখার উৎপত্তি ঘটিতে পারে, যাহারা বিবাহসম্বন্ধ স্বীয় ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা করে, আমরা জাতিতত্ত্বের সম্বন্ধে অন্তত এইটুকু শিক্ষা লাভ করিলাম। কিন্তু জাতিতত্ত্বের ইহাই সবটুকু নয়।

পঞ্চম অধ্যায়

ভারতবর্ষে আর্যসমাজের গঠন

ভারতবর্ষে বৈষ্ণব শাক্ত শৈব প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মত এক সময়ে সূর্য-উপাসক সৌরসম্প্রদায়েরও যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব ছিল। ঐতিহাসিকগণ পৌরাণিক কাহিনীর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে অনুমান করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের অনার্যজাতীয়া সহধর্মিণীর পুত্র শাম্বের দ্বারাই উদীচ্য দেশীয় সূর্যমূর্তির পূজা ভারতবর্ষে প্রবর্তিত হইয়াছিল। হয়তো আফগানিস্থানের উত্তর এবং আরাল সাগরের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত অঞ্চল হইতে একশ্রেণীর পুরোহিত সূর্যমূর্তি বা মিত্র দেবতার পূজা লইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। প্রাচীনকালে মিথ্র-উপাসক মাজি-সম্প্রদায় পারস্য দেশে যথেষ্ট প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। কিন্তু জরথুস্ত্রের অভ্যুদয় এবং ধর্মসংস্কারের ফলে তাঁহারা পারস্য হইতে নির্বাসিত হন। সম্ভবত তাঁহাদেরই কোনো শাখা শাকদ্বীপ হইতে, অর্থাৎ আফগানিস্থানের উত্তরস্থিত পূর্বোক্ত অঞ্চল হইতে অবশেষে ভারতবর্ষে আশ্রয়লাভ করেন।

এই শাকদ্বীপ সম্বন্ধে শাস্ত্রে লিখিত আছে যে সেখানকার বিপ্রগণ মগনামধারী। তাঁহারা জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। সেই মগ-জাতীয় পুরোহিতগণ যখন ভারতীয় সমাজে স্থান পাইলেন তখন তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণবর্ণের মধ্যে স্থান দেওয়া হইল। কেবল, তাঁহারা অপরাপর ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিম্ন মর্যাদার অধিকারী হইলেন।

এক জাতির মধ্যে কেমনভাবে উপজাতির সৃষ্টি হয় এবং এক বর্ণের মধ্যে কিভাবে ভিন্ন দেশ হইতে আগত জাতিও কৌলিক বৃত্তি অনুসারে স্থান পায়, ইহা আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয়। ক্ষত্রিয় বর্ণের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। উড়িষ্যায় কন্ধজাতীয় এবং মধ্যপ্রদেশে গণ্ডবংশীয় অনার্য শাসকগণ কালক্রমে ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে সম্মান এবং বৃত্তিদানের দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া এবং তৎসহ

নিজেরা শুদ্ধ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য আচারবিশিষ্ট হইয়া ক্ষত্রিয়ের পদমর্যাদা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এরূপ ঘটনা ভারতবর্ষের ইতিহাসে নিতান্ত বিরল নহে। ভারতীয় সমাজে বর্ণ-ব্যবস্থা এইরূপে বাহিরের জাতিকে নিজের কোলে স্থান দিয়া, অথবা সমাজের মধ্যে শিল্পের উৎকর্ষ বা আচারশুদ্ধির ফলে নানাবিধ শাখাপ্রশাখা বিস্তারের দ্বারা উত্তরোত্তর জটিল হইয়াছিল, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই।

রামায়ণ এবং মহাভারত

প্রাচীনকালে শূদ্রবর্ণের মনুষ্যও যে দ্বিজাতির মত তপশ্চর্যায় প্রবৃত্ত হইবার চেষ্টা করিত, রামায়ণের একটি কাহিনীতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। জনৈক ব্রাহ্মণের সন্তান অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহার জন্য রাজার কুশাসনই দায়ী, এইরূপ বিবেচনা করিয়া শোকার্ত ব্রাহ্মণ রাজসভায় অনশনের দ্বারা দেহত্যাগ করার সংকল্প গ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মহত্যার ভয়ে শ্রীরামচন্দ্র তখন ব্রাহ্মণকে সাময়িকভাবে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া রাজ্যের কোথায় অনাচার ঘটিতেছে তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। উত্তরকাণ্ডের অষ্টাশীতি ও একোননবতিতম অধ্যায় হইতে তাহার পরের ঘটনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

অনন্তর রাজর্ষিনন্দন রাম দক্ষিণদিকে আগমন করিয়া বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণস্থিত শৈবলগিরির উত্তরপার্শ্বে সুমহৎ সরোবর সন্দর্শন করিলেন। শ্রীমান্ রঘুনন্দন সেই সরোবরতীরে অধোমুখে লম্বমান তপঃপরায়ণ তাপসকে অবলোকন করিলেন। মহারাজ রাঘব উৎকৃষ্ট তপোনিরত তপস্বীর সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে সুব্রত! আপনি ধন্য! হে তপোবৃদ্ধ! আমি দাশরথি রাম, কৌতূহলবশতঃ আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, হে দৃঢ়বিক্রম! আপনি কোন্ জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? আপনি যে অন্যের সুদুষ্কর তপস্যা আচরণ করিতেছেন, তাহার অভিলষিত বর কি? স্বর্গলাভ অথবা অন্য কোন বর আপনার প্রার্থনীয়? হে তাপস! আপনি যাহা অবলম্বন করিয়া তপোনুষ্ঠান করিয়াছেন, আমি তাহা শুনিতে বাসনা করি। আপনি কি ব্রাহ্মণ?

অথবা দুর্জয় ক্ষত্রিয়? কিংবা তৃতীয়বর্ণ বৈশ্য? অথবা শূদ্র? আপনার মঙ্গল হইবে, অতএব সত্য বাক্য বলুন।

অধোমুখস্থিত তপস্বী নরপতি কর্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া নরপুঙ্গব দাশরথিকে জাতি ও যে কারণে তপস্যায় রত হইয়াছেন, তাহা বলিলেন।

তাপস অক্লিষ্ট কর্মা রামের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া অধোমুখ থাকিয়াই এই বলিলেন, হে মহাযশস্বিন্! আমি শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। হে রাম! উগ্রতপস্যা অবলম্বনপূর্বক দেবলোকজয় বাসনায় সশরীরে দেবতা হইবার প্রার্থনা করি। হে রাম! আমি আপনাকে মিথ্যা বলিতেছি না। হে কাকুৎস্থ! আপনি আমাকে শম্বুক নামক শূদ্র বলিয়া বিদিত হউন। সেই শম্বুক এই কথা কহিতে কহিতেই রাম কোষ হইতে সুরুচিরপ্রভ বিমল খড়্গ নিষ্কাশিত করিয়া তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। সেই শূদ্র নিহত হইলে ইন্দ্র অগ্নি বায়ু এবং ব্রহ্মা প্রভৃতি দেববৃন্দ 'সাধু—সাধু' বলিয়া কাকুৎস্থ রামচন্দ্রের প্রশংসা করত মহতী পুষ্পবৃষ্টি করিলেন।

কোল অথবা উরাঁওগণের মধ্যে শুদ্ধাচারী হইয়া হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইবার যে চেষ্টা দেখা গিয়াছিল, তাহা প্রাচীনকাল হইতে শুধু শম্বুকের মত এক-আধজন ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে নিবদ্ধ না থাকিয় বহু জাতির মধ্যেও প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিত, মহাভারতে তাহার এব প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। মহাভারতের শান্তিপর্ব কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল, তাহা সঠিক জানা নাই; তবে তাহা যে যথেষ্ট প্রাচীন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। শান্তিপর্বের মধ্যে পঞ্চষষ্ঠিতম অধ্যায়ে লিখিত আছে:

মান্ধাতা কহিলেন, হে ভগবান সুরনাথ! যবন কিরাত গান্ধার চীন শবর বর্বর শক তুষার কঙ্ক পহ্লব অন্ধ্র মদ্র পৌণ্ড্র পুলিন্দ রমঠ ও কাম্বোজগণ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন ইতরজাতি সকল এবং বৈশ্য ও শূদ্রগণ রাজ্য মধ্যে অবস্থান করিয়া কিরূপে ধর্ম আচরণ করিবে এ আমার ন্যায় মনুষ্যগণ কিরূপে দস্যুগণকে ধর্মে সংস্থাপিত করিবে? আমি এইসকল আপনারই নিকট হইতে শুনিতে ইচ্ছা করি, কারণ আপনিই মদ্বিধ ক্ষত্রিয়গণের পরম বন্ধু। ইন্দ্র কহিলেন, সমস্ত দস্যুগণেরই মাতা, পিতা, আচার্য, গুরু, আশ্রমবাসী এবং ভূপতিগণের সেবা করা কর্তব্য। বেদোক্ত ধর্মকর্মসকল এবং শ্রাদ্ধাদি পিতৃযজ্ঞ শূদ্রেরও

কর্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে। তাহারা সময়ানুসারে নিয়তই দ্বিজগণকে কূপ প্রপা শয্যা এবং ইতর দানসকল প্রদান করিবে। দস্যুগণের নিয়ত অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, শৌচ ও অদ্রোহ, বৃত্তি, দায় সকলের পালন এবং স্ত্রী-পুত্রাদির ভরণ এইসকল ধর্ম আচরণ করা কর্তব্য। সেই ঐশ্বর্যাভিলাষী দস্যুগণের সকল প্রকার যজ্ঞ করিয়া শাস্ত্রোক্ত দক্ষিণা ও মহার্হ পাকযজ্ঞ করিয়া সর্বভূতে অন্ন প্রদান করা কর্তব্য। হে অনঘ মহারাজ! পূর্ব হইতে দস্যুবৃত্তিগণের পক্ষে এইসকল কর্মই বিহিত হইয়াছে এবং সকল লোকেরই এইরূপ আচরণ করা কর্তব্য। মান্ধাতা কহিলেন, মনুষ্যলোকে আশ্রম চতুষ্টয়ে এবং সকল বর্ণেই লিঙ্গান্তরে বর্তমান দস্যুসকল নষ্ট হইয়া থাকে, ইহার কারণ কি? ইন্দ্র কহিলেন, হে অনঘ! দণ্ডনীতি বিনষ্ট এবং রাজধর্ম নিরাকৃত হইলে লোক সকল রাজদৌরাত্ম্যে সর্বতোভাবে প্রমোহিত হইয়া থাকে। মহারাজ! এই সত্যযুগ নিবৃত্ত হইলে আশ্রম-সকলের বিকল্প উপস্থিত হইবে এবং পৃথিবীতে অসংখ্য জটাদি চিহ্নধারী ভিক্ষুকসকল বিচরণ করিবে। তাহারা কামক্রোধবশীভূত হইয়া পুরাতন ধর্মসকলের পরম গতিতে অবজ্ঞা প্রদর্শন করত অসৎপথ অবলম্বন করিবে। পরন্তু দণ্ডনীতি দ্বারা পাপমতি নিবৃত্ত হইলে সেই মঙ্গলময়, পরম, শাশ্বত ধর্ম কখনই বিচলিত হয় না।

অর্থাৎ, অন্তত মহাভারতের যুগ হইতে নানা জাতিকে বর্ণব্যবস্থার মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখা যায়। রাজার শাসন শিথিল হওয়ার ফলে নানা দস্যুজাতি লিঙ্গান্তর গ্রহণ করিয়া বিবিধ বর্ণে প্রবেশলাভ করিত। তাহাদের পক্ষে ব্রাহ্মণাদিষ্ট নীতি ও আচারব্যবহার এবং যজ্ঞাদিধর্ম অনুসরণ করা কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছিল।

বর্ণধর্মের লক্ষ্য কি?

শ্রুতি ও স্মৃতিগ্রন্থের বিচার

উপরোক্ত প্রসঙ্গ পাঠ করিলে আমাদের স্বতই মনে প্রশ্ন জাগে, ভারতবর্ষে যে চাতুর্বর্ণ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তহার উদ্দেশ্য কি ছিল? এ সম্বন্ধে যদি আমাদের স্পষ্ট ধারণা জন্মে, তাহা হইলে ইতিহাসের

বিভিন্ন যুগে চাতুর্বর্ণ্যের মধ্যে কি কি পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ হইতে পারে। সেই উদ্দেশ্যে প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থের কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক।

ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তের একটি মন্ত্রে বলা হইয়াছে, সেই বিরাট পুরুষের 'ব্রাহ্মণ মুখ ছিলেন, রাজন্য বাহুস্বরূপ ছিলেন, তাঁহার উরু বৈশ্য ছিলেন এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্র জাত হইয়াছিলেন।' ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এগুলিকে বর্ণ বলা হইয়াছে, জাতি নহে। ঋগ্বেদের উল্লিখিত মন্ত্রের সরল অর্থ করিলে মনে হয়, চারিটি বিশেষ গুণসম্পন্ন এবং বিভিন্ন কর্মবিশিষ্ট বর্ণের সমাবেশের দ্বারা সমগ্র সমাজদেহ গঠিত হইয়াছে। সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের বিভিন্ন মাত্রার সংযোগের ফলে চারি বর্ণের মধ্যে গুণের তারতম্য দেখা যায়। বর্ণগুলি যে শুধু নরসমাজেই আবদ্ধ তাহা নহে, ভূমি অথবা মন্দিরের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি বিভিন্ন শ্রেণীভেদ আছে, ইহা অনেকের নিকটেই হয়তো অজ্ঞাত নহে।

বস্তুত বর্ণবিভাগকে মানবসমাজ হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে বর্গ বিভাগ করিবার একটি বিশেষ রীতি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। প্রাচীন ভারতবর্ষের মানুষ যখনই বিভিন্ন জাতির সহিত পরিচিত হইয়াছে, তখন গুণ ও কর্ম দেখিয়া কোন না কোন বর্ণের মধ্যে সেই জাতির স্থান নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু যদি কোন জাতির অভ্যস্ত কর্ম ঠিক ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের কোনটির সঙ্গেই হুবহু মিলিয়া না যায়, তাহাদিগকে মিশ্র গুণসম্পন্ন বলিয়া মনে হয়, তবে সেই জাতি কোন্ বর্ণে স্থান পাইবে? এই সমস্যা মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, গৌতম প্রভৃতি বিভিন্ন স্মৃতিকারগণকে যথেষ্ট আলোড়িত করিয়াছিল। তন্মধ্যে মনুসংহিতায় স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে:

> সুবিদিত যাবতীয় সঙ্কর জাতির জনকজননীর নাম নির্দ্দেশ করিলাম; এতদ্ভিন্ন অন্যান্য প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশমান জাতি কর্ম্ম দ্বারা জ্ঞেয়। ১০।৪০
>
> বর্ণবহির্ভূত সবিশেষ অবিদিত, সঙ্করজাতিসম্ভূত, আপাততঃ আর্য্যবৎ প্রতীয়মান কিন্তু অনার্য্য—এবম্ভূত ব্যক্তির কর্ম্মদর্শনে জাতিনির্ণয় করিবে। ১০।৫৭

অসম্বংশসম্ভূত ব্যক্তি পিতৃপ্রকৃতিসম্পন্ন বা মাতৃপ্রকৃতিসম্পন্ন অথবা তদুভয়সম্পন্ন হয়, নিজ নীচকুলোদ্ভূতি কোনরূপে গোপন করিতে পারে না। ১০।৫৯

মহাকুলপ্রসূত ব্যক্তিরও জননে কোন দোষ থাকিলে, সে অবশ্যই অল্প পরিমাণে হউক আর প্রচুর পরিমাণেই হউক, তাহার পিতৃস্বভাবের অনুকরণ করিবে। ১০।৬০

পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে কেহ বীজের প্রশংসা, কেহ ক্ষেত্রের প্রশংসা, কেহ বা ক্ষেত্র ও বীজ—উভয়েরই প্রশংসা করিয়া থাকেন—এই সন্দিগ্ধ স্থলে বক্ষ্যমাণ ব্যবস্থা প্রশস্ত। ১০।৭০

উষর ভূমিতে উপ্ত বীজ কোন প্রকারে অঙ্কুরিত না হইয়া বিনষ্ট হয় এবং বীজরোপণ বিনা উর্ব্বর ভূমিও নিষ্ফল পড়িয়া থাকে। এতদ্দ্বারা সুবীজ ও সুক্ষেত্র—উভয়েরই প্রশংসা করা হইল। ১০।৭১

কেবল বীজপ্রভাবেই তির্য্যগ্‌জাতিসম্ভূত ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতি ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়া বেদবিজ্ঞানাদি দ্বারা প্রশস্ত ও সর্বজনের অর্চ্চনীয় হইয়াছিলেন। এজন্য সুবীজ সতত প্রশংসিত হইয়া থাকে। ১০।৭২

ব্রহ্মা সবিশেষ এই ধার্য্য করিয়াছেন যে, দ্বিজকর্ম্মানুষ্ঠানকারী শূদ্র ও শূদ্রকর্মানুষ্ঠানকারী দ্বিজ—ইহারা উভয়ে পরস্পর সমও নয় এবং অসমও নয়। ১০।৭৩

মনুসংহিতা পাঠ করিলে আমরা আরও দেখিতে পাই যে, প্রত্যেক জাতিরই একটি নির্দিষ্ট বৃত্তি ছিল। সেই জাতিগত বৃত্তির বিষয়ে বিবেচনা করিয়া স্মৃতিকারগণ কোন্ জাতির পক্ষে কোন্ বর্ণের মধ্যে স্থান পাওয়া উচিত তাহা নির্ধারণ করিতেন এবং প্রত্যেকে কিরূপ সামাজিক মর্যাদার অধিকারী হইবে তাহাও স্থির করিয়া দিতেন। শব্দের যেমন সন্ধিবিচ্ছেদ হয়, স্মৃতিকারগণও সেইরূপ জাতিবিশেষের উৎপত্তি সম্বন্ধে সন্ধিবিচ্ছেদের চেষ্টা করিতেন। ইহার কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছেঃ

বক্ষ্যমাণ ক্ষত্রিয়েরা উপনয়নাদি সংস্কারাভাবে এবং যজনাধ্যয়নাদির অভাবে ক্রমশঃ শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছেন। ১০।৪৩

'পৌণ্ড্রক', 'ঔড্র', 'দ্রাবিড়', 'কাম্বোজ', 'জবন', 'শক', 'পারদ', পহ্লব',

'চীন', 'কিরাত', 'দরদ' এবং 'খশ'—এ কয়েক দেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়েরা পূর্বোক্ত কর্ম্মদোষে শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছে। ১০।৪৪

ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে ক্রিয়ালোপাদি কারণে যাহারা বাহ্যজাতি বলিয়া পরিগণিত হয়,—সাধুভাষীই হউক আর ম্লেচ্ছভাষীই হউক, উহারা 'দস্যু' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১০।৪৫

দ্বিজাতি হইতে অনুলোমক্রমে সমুৎপন্ন সন্তানদিগের নাম 'অপশদ', এবং প্রতিলোমজ সন্তানদিগের নাম 'অপধ্বংসজ'; যাবতীয় দ্বিজবিগর্হিত কর্ম্মই ঐ সকল জাতির উপজীবিকা। ১০।৪৬

সূত জাতির বৃত্তি,—অশ্বসারথ্য; অম্বষ্ঠের বৃত্তি—চিকিৎসা; বৈদেহিক জাতির বৃত্তি—অন্তঃপুররক্ষা এবং মাগধ জাতির বৃত্তি—স্থল ও জলপথে বাণিজ্য করা। ১০।৪৭

নিষাদ জাতির বৃত্তি—মৎস্যমারণ; আয়োগবের কাষ্ঠতক্ষণ এবং মেদ, চঞ্চু, অন্ধ্র এবং মদ্গু—এই জাতিচতুষ্টয়ের বৃত্তি—আরণ্যপশুহিংসা। ১০।৪৮

ক্ষত্র, উগ্র এবং পুক্কস—এই জাতিত্রয়ের বৃত্তি—বিলবাসী গোধাদির বধ বা বন্ধন; ধিগ্বণ জাতির চর্ম্মকার্য্য এবং বেণজাতির বৃত্তি—করতাল ও মৃদঙ্গাদিবাদন। ১০।৪৯

ঐসকল জাতি স্ব স্ব বৃত্তি অবলম্বনে জীবনধারণ করিয়া চৈত্যবৃক্ষ-মূলে, পর্ব্বতসমীপে, শ্মশানে বা উপবনে বাস করিয়া থাকে। ১০।৫০

চণ্ডাল এবং শ্বপচ জাতির বাসস্থান গ্রামবহির্ভাগে দেয়, এবং ইহাদিগকে পাত্ররহিত করা কর্ত্তব্য; কুক্কুর ও গর্দ্দভ মাত্র ইহাদের ধন। মৃতবস্ত্র পরিধেয়, ভগ্নপাত্রে ভোজন, লৌহনির্ম্মিত অলঙ্কার আভরণ এবং একস্থানে অবস্থিত না থাকিয়া সর্ব্বদা পরিভ্রমণ ইহাদের নিত্যকর্ম্ম। ১০।৫১, ৫২

সাধুরা যখন বৈধকর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত থাকিবেন, তখন ইহাদিগের দর্শনাদি ব্যবহার নিষেধ; ইহাদের বিবাহ ক্রিয়া স্বজাতির মধ্যে সম্পন্ন হইবে এবং ঋণগ্রহণাদিব্যবহার ভদ্রলোকের সহিত না হইয়া স্বজাতির সহিত সেসকল সম্পন্ন হইবে। ১০।৫৩

ইহাদিগকে অন্ন প্রদান করিতে হইলে, ভদ্রলোকেরা ভৃত্য দ্বারা ভগ্ন-পাত্রে অন্ন প্রেরণ করিবেন; এবং গ্রামে বা নগরে রাত্রিকালে ইহাদের যাতায়াত একেবারে নিষেধ। ১০।৫৪

রাজনির্দ্দিষ্ট চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া স্বকার্য্য সাধনার্থ উহারা দিবাভাগে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিবে এবং অনাথ-শব গ্রাম হইতে বহির্নিক্ষেপ করিবে। ১০।৫৫

রাজদণ্ডে যাহাদের প্রাণবিনাশ স্থির হইবে, ইহারা তাহার বধসাধন করিবে এবং ঐ বধ্যব্যক্তির বস্ত্রালংকার ও শয্যা ইহাদের প্রাপ্য হইবে। ১০।৫৬

ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পরিণীতা-বৈশ্যার গর্ভসমুৎপাদিত সন্তান 'অম্বষ্ঠ', পরিণীতা শূদ্রার গর্ভসম্ভূত সন্তানেরা 'নিষাদ' বা 'পারশব' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১০।৮

ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক শূদ্রাগর্ভসম্ভূত সন্তান 'উগ্র' নাম প্রাপ্ত হয় এবং জনক-জননীর স্বভাবানুসারে নিজে ক্রূরচেতা ও ক্রূরকর্ম্মা হইয়া থাকে। ১০।৯

শাস্ত্রালোচনার উপসংহার

হিন্দুসমাজ বহুদিন যাবৎ নানা জাতির সংহতির দ্বারা গড়িয়া উঠিয়াছে। কালক্রমে কৃষি-শিল্পাদি ব্যাপারেও নানাবিধ উৎকর্ষের আবির্ভাব হইয়াছে। প্রতি দেশে স্থানীয় প্রয়োজন অনুসারে এক এক জাতি হয়তো বিশেষ কোন বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল। যে জাতি বা কুলের সমষ্টি একটি বৃত্তি অবলম্বন করিত, ব্রাহ্মণশাসিত সমাজের নিয়ন্তাগণ সেই বৃত্তিতে সেই কুলের বংশানুক্রমিক অধিকার ধার্য করিয়া দিতেন।

ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে কতকগুলি গুণকে উত্তম কতকগুলিকে অধম বলিয়া বিবেচনা করা হইত। কুক্কুট, শূকর ইত্যাদি হেয় জন্তু, মৎস্যজীবী হেয় জাতি, গর্দভপালক হেয় জাতি; কিন্তু গোপালক, অশ্বপালক শুদ্ধ। চর্মজীবী অশুদ্ধ; রেশমী বস্ত্র শুদ্ধ, কিন্তু কার্পাসজাত বস্ত্র অপেক্ষাকৃত অশুদ্ধ। কেনই বা কোন বিশেষ বৃত্তিকে শুদ্ধ এবং অপর কোন বৃত্তিকে অশুদ্ধ বিবেচনা করা হইত, তাহা উপস্থিত আমাদের বিচারের বিষয় নহে। উপস্থিত শুধু এইটুকু লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, শুদ্ধি এবং অশুদ্ধির মানদণ্ড অনুসারে সমাজে বিভিন্ন জাতির পদ

নির্ণয় করা হইত। হেয় জাতির মধ্যে কাহাকেও স্পর্শের অযোগ্য, কাহাকেও বা দর্শনের পর্যন্ত অযোগ্য মনে করা হইত।

এইরূপে মান্য এবং হেয় বহু জাতির সংহতির দ্বারা এক বৃহৎ হিন্দুসমাজ গঠিত হইল। কিন্তু সকল জাতিকেই মৌলিক চারি বর্ণের কোন না কোনটির মধ্যে স্থান দেওয়া হয়; কেননা মনুষ্যসমাজে চারি বর্ণের অতিরিক্ত পঞ্চম বর্ণের স্থান ছিল না।

আমরা আরও দেখিতে পাই যে, প্রতি নিম্নবর্ণের জাতির মধ্যে উচ্চ-বর্ণের রীতিনীতি বা আচার-ব্যবহার অনুকরণের প্রবৃত্তি ছিল। সম্মানিত ব্যক্তির নিকট সম্মান লাভ করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? এবং সেজন্য সম্মানিত ব্যক্তির অনুকরণই তো সর্বাপেক্ষা সহজ পথ। এইরূপ চেষ্টার ফলে হয়তো একই জাতির মধ্যে আচার পরিবর্তন, অথবা ক্ষেত্রবিশেষে বৃত্তির পরিবর্তনহেতু নূতন নূতন উপজাতির উদ্গম হইত। শেষে এইরূপ উপজাতি বিবাহ সম্বন্ধ একান্তভাবে নিজের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখিলে একটি স্বতন্ত্র জাতিতেই পরিণত হইত।

হিন্দুসমাজের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে যে সকল শ্রেণীভেদ লক্ষিত হয় এবং শাস্ত্রকারগণ যে সকল ব্যবস্থা দ্বারা সমাজ পরিচালনের চেষ্টা করিতেন, এই উভয় বস্তুকে একত্র করিলে ধীরে ধীরে হিন্দুসমাজের গঠন সম্বন্ধে আমাদের মনে একটি সংহত চিত্র ফুটিয়া উঠে। এইবার শাস্ত্রের অরণ্যপথ পরিহার করিয়া অন্য এক দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাক।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভারতবর্ষে আর্যসংস্কৃতির প্রকৃতি

হোলি উৎসব

বসন্তকালে উত্তর ভারতের সর্বত্র হোলি অথবা হোলাকা উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। বাঙলাদেশে বসন্তকালে শুক্লা চতুর্দশীতে চাঁচর নামে একটি অনুষ্ঠানের দ্বারা ইহার সূচনা হয়। কোথাও কোথাও চাঁচরকে মেড়া পোড়ানো বা বুড়ির ঘর পোড়ানো বলে। খড় ও বাঁশ দিয়া একটি, ছোট্ট ঘরের মত গড়িয়া তাহার মধ্যে স্থানবিশেষে পিটুলির তৈয়ারি একটি মানুষ বা ভেড়ার মূর্তি রাখার পর যথারীতি বিষ্ণুপূজা করিয়া সেই ঘরে অগ্নিসংযোগ করা হয়। উড়িষ্যায় কিন্তু মূর্তির পরিবর্তে একটি জীবন্ত ভেড়াকে দগ্ধ করিবার রীতি আছে। কেওনঝর রাজ্যে ঐ প্রথা প্রচলিত থাকিলেও শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথদেবের মন্দিরে ভেড়াটিকে দগ্ধ না করিয়া শুধু গায়ে একবার আগুন স্পর্শ করাইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। যুক্তপ্রদেশের মধ্যে মথুরাতে একজন মানুষকে আগুনের শিখার ভিতর দিয়া লাফাইয়া যাইতে হয়। গোরখপুর জেলায় হোলি উপলক্ষে একটি বানরকে সংহার করিয়া গ্রামের সীমানায় তাহাকে রাখিয়া দেওয়া হয়। যুক্তপ্রদেশে কোন কোন স্থানে হোলির সময় গায়ে ফুল ও গন্ধের প্রলেপ মাখিয়া, সেই বস্তু পরে ঘষিয়া তুলিয়া আগুনে দিবার বিধি আছে; তৎসহ মানুষটি যত দীর্ঘ, তত দীর্ঘ একখণ্ড সুতা মাপিয়া আগুনে পোড়াইয়া ফেলিতে হয়। বিহার প্রদেশে আগুনের সঙ্গে মানুষ বা ভেড়ার মূর্তির কোনও সম্বন্ধ নাই। সেখানে চতুর্দশীর পরিবর্তে পূর্ণিমার রাত্রে ছেলেরা চুরি-চামারি করিয়া কাঠ সংগ্রহ করে এবং তাহাতে আগুন ধরায়। সেই আগুনে ছোলাগাছ, তিসি, সুপারি, নারিকেল, পিঠা প্রভৃতি নিবেদন করার রীতি প্রচলিত আছে।

হোলি উপলক্ষে ভক্তিমূলক নানাবিধ গান ভিন্ন দরিদ্র বা নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বিহার ও যুক্তপ্রদেশে অশ্লীল গান গাওয়ার রীতি আছে। পূর্ব-কালে কাঠের তৈয়ারি অশ্লীল মূর্তি অথবা বন্ধকাম লইয়া লোকে পথে পথে কোলাহল করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত; এখনও মধ্যভারতে ইন্দোর-রাজ্যে নাকি ইহা সম্পূর্ণ উঠিয়া যায় নাই। স্ত্রীলোকগণ সম্মুখে পড়িলে নানাবিধ কামসূচক অঙ্গভঙ্গিসহকারে তাহাদের ব্যঙ্গ করা হয়, সেই ভয়ে হোলির দিনে স্ত্রীলোকেরা পারতপক্ষে পথে বাহির হয় না। মধ্যপ্রদেশে বণিক জাতির মধ্যে হোলির সময়ে খেলাচ্ছলে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে সংগ্রাম হয়, কিন্তু গন্ডজাতির মধ্যে ইহা আরও উগ্র আকার ধারণ করে। মথুরায় জাঠগণের মধ্যে স্ত্রীপুরুষের দ্বন্দ্ব নৃত্যের ছলে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বাঙলাদেশে এক সময়ে আদিরসাত্মক গানের প্রচলন ছিল, কিন্তু আজকাল তাহা আর নাই; শুধু পরিবারের মধ্যে যাহাদের সহিত ঠাট্টাতামাসার সম্পর্ক আছে তাহাদের লইয়া দোলের সময়ে একটু বেশি আমোদপ্রমোদ করা হয়।

রাজসাহী মৈমনসিংহ বরিশাল মেদিনীপুর হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে গঞ্জাম জেলা, পশ্চিমে হাজারিবাগ, এমনকি সুদূর কুমায়ুন পর্যন্ত সর্বত্র হোলির পরে যে ছাই পড়িয়া থাকে, তাহাকে লোকে বিশেষ দৈবগুণসম্পন্ন বলিয়া বিবেচনা করে। গঞ্জাম জেলায় সেই ছাই মাঠে ছড়াইলে দ্বিগুণ ফসল হইবে বলিয়া লোকে বিশ্বাস করে। কোথাও বা শস্যে পোকা লাগিবে না এই ভরসায় ছাই গোলার মধ্যে রাখিয়া দেয়। হাজারিবাগ জেলায় হোলির পোড়া কাঠ কোনো ফলগাছের উপর দিয়া ছুড়িয়া ফেলিলে দ্বিগুণ ফল ধরিবে বলিয়া লোকে মনে করে। মধ্য-প্রদেশে গন্ডজাতি হোলির আগুনে তপ্ত লাঙলের ফাল দিয়া বৎসরে প্রথমবার ভূমিকর্ষণ সমাধা করে।

চাঁচর বা হোলি কবে প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল সে সংবাদ সঠিক জানা নাই। জৈমিনিপ্রণীত পূর্বমীমাংসার শবরস্বামিকৃত ভাষ্যে হোলাকার উল্লেখ আছে। সেই ভাষ্য অন্তত খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়া ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন। শবরস্বামীর ভাষ্যে বলা হইয়াছে, হোলাকা প্রাচীনকাল হইতে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

হোলির উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাবিধ অসংলগ্ন কাহিনী প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু সেগুলির ঐতিহাসিক মূল্য কিছু নাই।

হোলাকা উৎসবের সঙ্গে তথাকথিত হীন জাতির সম্পর্কের একটি প্রমাণ বোম্বাই প্রদেশে পাওয়া যায়। ঐ উৎসব উপলক্ষে কোঙ্কনের ব্রাহ্মণগণকে আনুষ্ঠানিকভাবে তথাকথিত হীন জাতীয় কোন ব্যক্তিকে স্পর্শ করিতে হয়, অথচ অপর সময়ে তাহাতে স্পর্শদোষ জন্মায়। বিহারে হোলাকায় অগ্নিসংযোগ সচরাচর ব্রাহ্মণ অথবা গ্রামের বৃদ্ধ ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত হইলেও ভাগলপুর জেলায় সে অধিকার শুধু ডোমজাতীয় লোকেদেরই আছে। ডোমেরা সেখানে বাঙলা দেশের মতই অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য হয়।

ভারতবর্ষের অরণ্যচারী জাতিবৃন্দের মধ্যে হোলাকার মত কোনও অনুষ্ঠান আছে কিনা, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে আমরা কয়েকটি অর্থপূর্ণ তথ্যের সন্ধান পাই। উড়িষ্যার দক্ষিণভাগে কন্ধ জাতির মধ্যে কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত মেরিয়া নামক নরবলির প্রচলন ছিল। প্রায় শত-বর্ষ হইতে কন্ধগণ বাধ্য হইয়া মানুষের পরিবর্তে মহিষ বলি দিয়া আসিতেছে। ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির জন্য একজন মানুষকে খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার মাংস ক্ষেতের মাটিতে পুতিয়া দেওয়ার রীতি ছিল। কোনো কোনো গ্রামে আবার সেই ব্যক্তিকে ধীরে ধীরে দগ্ধ করিয়া ছাইগুলি মাঠে বা যে নদী হইতে সেচ দেওয়া হইত, সেই নদীর জলে মেশানো হইত। মানুষটিকে বলি দেওয়ার পরদিবস তাহার মাথা এবং দেহের অবশিষ্ট অংশ ও অস্থি যথাসম্ভব সংগ্রহ করিয়া একটি জীবন্ত ভেড়ার সঙ্গে একত্র দগ্ধ করা হইত। এইদিনের ছাই মাঠে ছড়ানো হইত অথবা জলে গুলিয়া ঘরে বা শস্যের গোলায় শস্য রক্ষা হইবে, এই আশায় লেপিয়া দেওয়া হইত।

কন্ধ জাতির মধ্যে মেরিয়া-সংহার উপলক্ষে অসম্ভব মদ্যপান এবং স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যথেচ্ছ সংগমের রীতি ছিল। কন্ধদের ধারণা, ধরিত্রী দেবী শস্যের মধ্য দিয়া আমাদিগকে যে প্রাণশক্তি বিতরণ করেন, আমরা নরবলি দিয়া সেই প্রাণশক্তি ধরিত্রীকে প্রত্যর্পণ করিতে পারি। ভূমির

উর্বরা-শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যে অনুষ্ঠান, সে উপলক্ষে নরসমাজের মধ্যেও অবাধ কামচেষ্টা হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক।

কন্ধদের মধ্যে প্রচলিত অনুষ্ঠানটির সঙ্গে হোলির সাদৃশ্য আকস্মিক হইতে পারে না। হয়তো কোনও সময়ে সমগ্র উত্তর এবং মধ্য ভারতে ভূমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নরবলির প্রচলন ছিল। পরে ব্রাহ্মণ্য বা আর্য রীতিনীতি প্রসারের ফলে তাহা পরিবর্তিত অথবা ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল। কেবল কন্ধদের মত অরণ্যাশ্রয়ী জাতির মধ্যে তাহা অপেক্ষাকৃত অবিকৃত অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে। হিন্দুদের মধ্যে কোথাও আগুনের মধ্য দিয়া মানুষকে লাফাইয়া যাইতে হয়, কোথাও বা পিটুলির মানুষকে দহন করিতে হয়। কোথাও জীবন্ত ভেড়া পোড়ানো হয়, কোথাও বা তাহার মূর্তি। বহুস্থানে দাহের পরে ছাই সংগ্রহ করিয়া শস্যের বা শস্যক্ষেত্রের উন্নতিবিধানের চেষ্টা দেখা যায়। নরবলির পরিবর্তে যেমন তাহার এক লঘু সংস্করণ প্রবর্তিত হইয়াছে, পূর্বের অবিমিশ্র কামচেষ্টার পরিবর্তে তেমনই কামভাবান্বিত ভঙ্গি অথবা গান কিংবা শুধু সামান্য ঠাট্টা-তামাসা অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে।

হিন্দুধর্মাবলম্বী বিভিন্ন জাতির সামাজিক অনুষ্ঠানগুলির বিশ্লেষণ করিলেও আমরা এইরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তের সাক্ষাৎ পাই। কোথাও প্রাচীন কোনো গ্রাম-দেবতার পূজা এখনও অজলচল জাতির অধিকারে রহিয়াছে, অথচ উচ্চবর্ণের সকল জাতি সেই দেবতার পূজায় অনার্যের পৌরোহিত্য স্বীকার করিয়া থাকেন। কটক জেলায় বাঁকির নিকট বৈদ্যেশ্বর এবং রামনাথ মহাদেবের মন্দিরের সেবক অজলচল মালি জাতির মানুষ। পুরীতে জগন্নাথদেবের মূর্তিসংক্রান্ত যাবতীয় কাজে শবর জাতির দৌহিত্রবংশজ দইতাপতিগণের কেবল অধিকার আছে। হিন্দুধর্মাবলম্বী বহু জাতির মধ্যে বিবাহের সময়ে প্রচলিত স্ত্রী-আচারের বিশ্লেষণ করিলে মনে হয়, ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের পূর্বে বিবাহের যে অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল, তাহা আজ স্ত্রী-আচারের আকারে পর্যবসিত হইয়াছে। এইসকল সামাজিক রীতিনীতি বা আচার-ব্যবহার, দেশাচার এবং লোকাচার নামে ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণের নিকট মর্যাদা লাভ করিয়া থাকে। নানা জাতি যখন ব্রাহ্মণের অধীনতা স্বীকার করিয়া

বৃহত্তর হিন্দুসমাজ গঠন করিতে লাগিল, তখন কাহারও আচার-অনুষ্ঠানকে অকারণে নষ্ট করা হয় নাই। কেবল ব্রাহ্মণ্যনীতির পরিপন্থী কোনও আচার বা অনুষ্ঠান থাকিলে তাহাকে পরিমার্জিত ও সংশোধিত করিয়া লওয়া হইত। ইসলাম, খৃষ্টীয় অথবা ইহুদিগণের ধর্ম কিন্তু এ বিষয়ে স্বতন্ত্র। সেখানে কোনো মানুষ অপর ধর্ম হইতে আসিয়া স্থান পাইলে তাহাকে পূর্বসংস্কার প্রায় সর্বথা বিসর্জন দিয়া আসিতে হয়। কিন্তু হিন্দুধর্মের ঔদার্যের ফলে হিন্দুসমাজের মধ্যে অঙ্গীভূত বিভিন্ন জাতিকে সেরূপ ত্যাগ স্বীকার করিয়া আসিতে হয় না। ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজে স্থান পাইবার পরেও অনেকের মধ্যে প্রাক্তন নাচ, গান, সামাজিক আচার-বিচার বহুলাংশে অক্ষত অবস্থায় থাকিয়া যায়।

ব্রাহ্মণ্য সমাজের শীর্ষস্থানীয় মুনিঋষিগণ স্বীকার করিতেন যে, সকল মানুষের মন সমান স্তরের নয়। অতএব সকলের পক্ষে মানসিক বিকাশের জন্য একই ভাবধারার আশ্রয় প্রয়োজন হয় না। সমাজে যখন নানা স্তরের মানুষ বাস করে, তখন ধর্মের মধ্যেও সকলের সুবিধার জন্য নানা পথ, নানা মতের স্থান থাকা উচিত। ফলত, হিন্দুসমাজ যেমন নানা জাতির সংশ্লেষের দ্বারা রচিত হইয়াছে, হিন্দুধর্মও তেমনই নানা মত ও পথের সংশ্লেষের দ্বারা বর্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে। হিন্দু-সমাজের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জাতিসমূহের ভিতর দ্বিজাতি এবং দ্বিজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণের স্থান যেমন সর্বোপরি, হিন্দুধর্মের মধ্যেও তেমনই নানা জাতির সংস্কৃতি স্থান পাইলেও বৈদিক সংস্কার এবং বৈদিক চিন্তাধারার স্থানও সর্বোপরি নির্দিষ্ট হইয়াছিল। হিন্দুধর্মের মধ্যে বহু দেবতার স্থান থাকিলেও, নদীর গতি যেমন সর্বশেষে সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়, এক্ষেত্রেও তেমনই সকল দেবতার পূজা অবশেষে অবাঙ্মানসগোচর ব্রহ্মজ্ঞানে পর্যবসিত হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায় বিষয়টি অতি প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীভগবান বলিতেছেন ১

> যাহারা অন্য দেবতার ভক্ত হইয়া শ্রদ্ধা অর্থাৎ আস্তিক্যবুদ্ধিসমন্বিত হইয়া থাকে, হে কৌন্তেয় তাহারাও অ-বিধিপূর্বক আমারই উপাসনা

---

১ শঙ্করভাষ্যের বঙ্গানুবাদ হইতে সংকলিত

করিয়া থাকে। এই স্থানে অ-বিধি শব্দের অর্থ অজ্ঞান অর্থাৎ তাহারা অজ্ঞানপূর্বক আমারই উপাসনা করিয়া থাকে। ৯।২৩

কেন এই কথা বলা হইল যে তাহারা অবুদ্ধিপূর্বক যজ্ঞ করিয়া থাকে? তাহার উত্তর এই যে, যে কারণে আমি বেদবিহিত ও ধর্মশাস্ত্র বিহিত সকল প্রকার যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু। আমি দেবতারূপে যজ্ঞের ভোক্তা 'অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র' এই শ্লোকে ইহাই বলা হইয়াছে যে, আমিই যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা প্রভু। কারণ, আমি যজ্ঞের স্বামী। [অন্য দেবতা ভক্তগণ] আমাকে যথার্থভাবে জানিতে পারে না, এইজন্যই তাহারা অবুদ্ধিপূর্বক উপাসনা করিয়াও উপাসনার সম্যক্ ফল হইতে প্রচ্যুত হইয়া থাকে। ৯।২৪

যাহারা ভক্তিমান অথচ অবিধি পূর্বক অন্য দেবতার উপাসনা করে, তাহাদেরও যাগফল অবশ্যম্ভাবি। কেন? [এরূপ হয়? তাহা বলা যাইতেছে যে]—'দেবব্রত' দেবতাগণের প্রীতির উদ্দেশ্যে ব্রতনিয়ম অর্থাৎ দেবতার প্রতি ভক্তি যাহারা করে, তাহাদিগকে 'দেবব্রত' কহা যায়; যাহারা দেবব্রত, তাহারা [নিজ নিজ ইষ্ট] দেবগণকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহারা 'পিতৃব্রত' শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াপরায়ণ, তাহারা অগ্নিষ্বাত্তাদি নামে প্রসিদ্ধ পিতৃগণকে প্রাপ্ত হয়। এইরূপ যাহারা ভূতগণ (অর্থাৎ) বিনায়ক, মাতৃগণ ও চতুঃষষ্ঠি যোগিনী প্রভৃতিকে উপাসনা করে, তাহারাও ভূতগণকেই প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যাহারা আমার উপাসনা করে, তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হয়। তাহাদিগকেই 'বৈষ্ণব' বলে। [অন্য দেবতার পূজার জন্য যে প্রয়াস, আমার পূজাতে সেই প্রকারই প্রয়াস] প্রয়াস সমান হইলেও লোক অজ্ঞানবশতঃ আমাকে ভজনা করে না; সুতরাং তাহারা অল্প ফল লাভ করিয়া থাকে। ৯।২৫

কেবল যে আমার ভক্তগণের নির্বাণ রূপ অনন্ত ফললাভ হয়, তাহাই নহে; আমার উপাসনাও কিন্তু বড় সুলভ [ইহাই বলা যাইতেছে] পত্র পুষ্প ফল 'তোয়' জল [প্রভৃতি যাহা কিছু হউক না কেন] যে আমাকে ভক্তির সহিত অর্পণ করিবে, সেই 'প্রযতাত্মা' অর্থাৎ শুদ্ধবুদ্ধির প্রদত্ত [সেই সকল পত্র প্রভৃতি] 'ভক্ত্যুপহৃত' ভক্তির সহিত উপহৃত [বস্তুগুলি] আমি 'ভক্ষণ'—গ্রহণ করিয়া থাকি। ৯।২৬

যে কারণ এইরূপ, সেই জন্য তুমি যাহা কর (অর্থাৎ) স্বতঃ (গমনাদি) যাহা ভক্ষণ কর, যে শ্রৌত অথবা স্মার্ত হোম কর, যে স্বর্ণঅন্ন ঘৃতাদি

ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া থাক এবং যাহা কিছু তপস্যাচরণ কর, তাহা [সকলই] আমাতে সমর্পণ কর। ৯।২৭

এই প্রকার কর্ম করিতে করিতে তোমার কি হইবে, তাহা শুন। শুভ ও অশুভ (অর্থাৎ) ইষ্ট ও অনিষ্ট ফল যাহাদের হয়, তাহাদের নাম 'শুভাশুভ ফল'। শুভাশুভ ফল বলিলে কর্মেই বুঝায়। সেই কর্মই বন্ধনস্বরূপ হইয়া থাকে এবং এই প্রকারে আমাতে কর্ম সমর্পণ করিয়া চলিলে সেই শুভাশুভ ফল কর্মবন্ধন হইতে মোক্ষলাভ করিবে। এই সেই সন্ন্যাসযোগ অর্থাৎ ইহা সন্ন্যাস হইয়াও যোগ; কারণ, আমাকে ফলাপর্ণ করিয়া কর্মানুষ্ঠানই ইহার স্বরূপ। সেই সন্ন্যাসযোগের সহিত যাহার 'আত্মা' অন্তঃকরণ যুক্ত হইয়া থাকে, তাহাকে 'সন্ন্যাসযোগ-যুক্তাত্মা' কহা যায়; তুমি এইরূপ সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা ও কর্মবন্ধন হইতে জীবিতাবস্থাতেই বিমুক্তি লাভ করিয়া, পরে এই দেহ পতিত হইলে আমাকে প্রাপ্ত হইবে (অর্থাৎ) মদ্ভাবকে লাভ করিবে। ৯।২৮

অথবা

স্বধর্ম বিগুণ হইলেও সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম হইতে 'শ্রেয়ান' প্রশস্যতর।......যেমন বিষজাত কৃমির পক্ষে বিষ দোষজনক নহে, সেইরূপ স্বভাব-নিয়ত কর্ম করিলে মানব 'কিল্বিষ' পাপ প্রাপ্ত হয় না।১৮।৪৭

হে কুন্তীনন্দন!—স্বভাবজ কর্ম সদোষ হইলেও তাহা পরিত্যাগ করিবে না; কারণ, ধূমের দ্বারা যেমন অগ্নি আবৃত হয়, সেইরূপ সকল কর্মই দোষের দ্বারা আবৃত হইয়া থাকে। ১৮।৪৮

সপ্তম অধ্যায়

ভারতের রূপ

রাজার দায়িত্ব

নানা জাতির সংশ্লেষের দ্বারা এবং কালক্রমে শিল্প ও অন্যান্য বিষয়ে উৎকর্ষের ফলে নূতন উপজাতি গঠনের দ্বারা যে জটিল হিন্দু সমাজ কালক্রমে গড়িয়া উঠিল, প্রাচীনকাল হইতেই তাহার পরিচালনভার রাজার উপরে ন্যস্ত ছিল। মহাভারতে ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে উপদেশচ্ছলে বলিতেছেন :

রাজন্! লোকশ্রেষ্ঠ ধর্মআচরণকারী ক্ষত্রিয়গণের বাহু দ্বারা লোকসকলকে আয়ত্ত করা কর্ত্তব্য, কারণ বেদে এইরূপ শ্রুতি আছে যে, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র এই ত্রিবর্ণের ধর্ম্ম ও উপধর্ম্ম সকল রাজধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

মহারাজ! যেরূপ ক্ষুদ্র জন্তুসকলের পদচিহ্ন সকল হস্তিপদচিহ্ন মধ্যে লীন হয়, তদ্রূপ সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মই রাজধর্ম্ম মধ্যে লীন বলিয়া জানিবে।......রাজগণ দণ্ডনীতিবিহীন হইলে, কর্ণধারবিহীন নৌকার ন্যায় ত্রয়ী নিমগ্ন হয়, সুতরাং সকল ধর্ম্মই নষ্ট হয়।

হে পাণ্ডুনন্দন! লৌকিক, বৈদিক, চাতুরাশ্রম্য এবং যতিধর্ম্ম সকল রাজধর্ম্মেই সমাহিত। হে ভরতসত্তম! সকল কর্ম্মই ক্ষাত্রধর্ম্মের অধীন; সুতরাং ক্ষাত্রধর্ম্ম অব্যবস্থিত হইলে জীবলোকসকল আশীর্বিহীন হয়।

প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজার ধর্ম অথবা কর্তব্য সম্বন্ধে গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে বৃহস্পতি, কৌটিল্য, শুক্রাচার্য প্রভৃতি লেখকের নীতিশাস্ত্র আংশিকভাবে উদ্ধার করা হইয়াছে। শুক্রনীতি* গ্রন্থে

---

* পণ্ডিত মিহিরচন্দ্রের শুক্রনীতি 'হিন্দী' সম্বৎ ১৯৬৪, বেঙ্কটেশ্বর প্রেস, বোম্বাই, এবং Benoy Kumar Sarkar: Sukraniti, Allahabad, 1914.

সমাজ পরিচালনার সম্পর্কে রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহার কিয়দংশ নীচে উদ্ধৃত করা গেল ঃ

নিজ নিজ জাতির জন্য যে ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে, যাহা চিরকাল পূর্ব্বজগণের দ্বারা আচরিত হইয়াছে, সে জাতি তদ্রূপ আচরণই করিবে। অন্যথা নৃপতির নিকট দণ্ডনীয় হইবে।......

(রাজা) কারু এবং শিল্পিগণকে রাষ্ট্রের মধ্যে কার্য্যের প্রয়োগ অনুসারে রক্ষা করিবেন। (তাহাদের সংখ্যা প্রয়োজনের) অতিরিক্ত হইলে কৃষি বা ভৃত্যের কাজে নিযুক্ত করিবেন।

প্রতিদিবস দেশ এবং শাস্ত্রোক্ত হেতু সম্বন্ধে বিচার করিয়া জাতি, জনপদ, শ্রেণী কুলের ধর্ম কি তাহা বিবেচনা করিয়া রাজা তদনুসারে (প্রজার বিচাররূপ) স্বধর্ম পালন করিলেন। যাহার যেরূপ ধর্ম তদনুসারে তাহার বিচার হইবে, অন্যথা প্রজাগণ ক্ষুব্ধ হইবে। দাক্ষিণাত্যে দ্বিজগণ মাতুল কন্যাকে বিবাহ করে।

মধ্যদেশে কারু এবং শিল্পিগণ (বিষ অথবা গোমাংস?) ভক্ষণ করে এবং সকলেই (মৎস্য বা মাংস?) আহার করে; স্ত্রীগণ ব্যাভিচারিণী হয়।

উত্তর দেশের স্ত্রীজাতি মদ্যপান করে, পুরুষেরা রজস্বলা স্ত্রীকে স্পর্শ করে, খশ জাতি ভ্রাতার মৃত্যুর পর ভ্রতৃভার্য্যাকে গ্রহণ করে।

পূর্ব্বোক্ত কর্মের জন্য ইহারা প্রায়শ্চিত্ত বা দণ্ডের যোগ্য হয় না। যে যে কর্ম পরম্পরাঅনুসারে প্রাপ্ত হইয়াছে অথবা যাহা পূর্ব্বজগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সে সে কর্মের দ্বারা দূষিত হয় না।

রাজার বিচারের সম্পর্কেও বলা হইয়াছে, কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে সেই শ্রেণীর ধর্ম অনুসারেই রাজা বিবাদের নির্ণয় করিবেন :

কিষাণ, কারু, শিল্পী, কুসীদজীবী, নর্ত্তক, সন্ন্যাসী, তস্কর, ইহাদের বিচার সেই শ্রেণীর নিয়মানুসারে করিবেন...।

যে বিচার কুলের লোকেদের বুদ্ধির দ্বারা সম্ভব নয়, তাহা শ্রেণীর সভ্যগণ করিবেন। শ্রেণীর সভ্যগণ না পারিলে গণের সভ্যেরা করিবেন। গণেরও অসাধ্য হইলে রাজার দ্বারা নিযুক্ত অধিকারী পুরুষ সেই বিচার করিবেন।

মহাভারত এবং শুক্রনীতি হইতে উদ্ধৃত বচন পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, সমাজে দণ্ডনীতি অথবা রাজাকে মেরুদণ্ড স্বরূপ বিবেচনা করা হইত। সেই দণ্ডনীতির অধীনে নানা জাতি স্বীয় কৌলিক ধর্ম, অর্থাৎ বৃত্তি এবং লৌকিক আচারাদি পালন করিয়া চলিত। রাজা প্রজাকুলকে উদ্বেজিত না করিয়া তাহাই বজায় রাখিয়া চলিতেন।

কিন্তু দেশের আর্থিক সংগঠনের আদর্শ কি ছিল? আদর্শ এবং বাস্তবে সর্বদাই একটি অন্তর পড়িয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবকে বুঝিতে হইলে সমাজে যে আদর্শ অনুযায়ী সংগঠনের চেষ্টা চলিয়াছিল, তাহাও যথাসাধ্য হৃদয়ঙ্গম করিবার প্রয়োজন আছে। কালক্রমে আদর্শের পরিবর্তন নিশ্চয়ই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলে বহু শতাব্দী ধরিয়া একটি আদর্শের প্রভাব দেখা যায়। তাহার বর্ণনা করিয়া, আমরা ক্রমে আদর্শের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে বিচার করিব। এখানে শুধু তাহার মোটামুটি বর্ণনা করা হইবে।

গ্রামাঞ্চলে উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা

এই উদ্দেশ্যে আমাদিগকে আবার শাস্ত্রগ্রন্থ পরিহার করিয়া গ্রামাঞ্চলে উৎপাদন ও বন্টনের ব্যবস্থা কিরূপ ছিল তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। ইংরেজ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত যে ধনতন্ত্র অতি প্রাচীন-কাল হইতে ভারতবর্ষের গ্রামদেশে প্রবহমান ছিল, তাহা আজ প্রায় সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হইয়াছে। তথাপি তাহার ছিন্ন বিছিন্ন অংশ যোগ দিয়া একটা সমগ্র রূপ পুনর্গঠন করা আংশিকভাবে সম্ভব হয়।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর দাস নামে জনৈক সরকারী কর্মচারী পুরী জেলায় ভূমিস্বত্বের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া গভর্মেণ্টের নিকট এক অতি মূল্যবান রিপোর্ট দাখিল করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুসন্ধানের ফলে দেখা যায় যে, মুসলমানী আমলের পূর্বে, অর্থাৎ হিন্দু রাজত্বকালে, উড়িষ্যায় ভূমির মালিকানা স্বত্ব রাজার অধিকারে ছিল এবং প্রজার শুধু তাহা ভোগ করার অধিকার ছিল। পুরী জেলার মধ্যে তিনি নিম্নলিখিত ব্যবস্থা দেখিতে পান।

সমগ্র জেলার মধ্যে তখনও চাকরান জমির কিছু কিছু ব্যবস্থা ছিল। (১) ৬০৫ জন ছুতারকে ৩৯৬ একর জমি ভোগ করিতে দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদিগকে গ্রামের চাষীদের চাষ সংক্রান্ত কাঠের সরঞ্জাম গড়িয়া (এবং মেরামত) করিয়া দিতে হইত। (২) ৫৬৯ জন কামার ঐরূপ কাজের জন্য ৩৬৬ একর জমি ভোগ করিতেছিল। (৩) গ্রামের জমিদার-বাড়িতে এবং সৈন্যসামন্ত যখন গ্রামের পথে যাতায়াত করে, তাহাদের রাঁধিবার হাঁড়িকুড়ি যোগাইবার জন্য ৩১ জন কুমোর ২৫ একর জমি ভোগ করিতেছিল। (৪) ১০৪১ জন ধোপা জমিদার এবং রায়তদের কাপড় কাচার জন্য ৬৬৩॥ একর জমি ভোগ করিতেছিল। (৫) জ্যোতিষী ব্রাহ্মণের কাজ ধান্যরোপণ অথবা বিবাহাদি শুভকর্মের জন্য দিনক্ষণের গণনা করা। তেমন ৩৭৫ জন জ্যোতিষীর ভোগে ১৩৩ একর জমি ছিল। (৬) নাপিতের কাজ ক্ষৌরকর্ম ও বিবাহাদি অনুষ্ঠানে কিছু কিছু সহায়তা করা। ৯৯০ জনের ভোগে ৭২৬ একর জমি ছিল। (৭) নদীর খেয়াঘাটে পারাপারের জন্য মাঝির সংখ্যা ছিল ৫৪; তাহাদের জন্য ৬৪॥ একর ভূমি বৃত্তিস্বরূপ নির্ধারিত ছিল। (৮) খোরধার নিকটে জঙ্গল পাহারা দিবার জন্য একজনকে ২ একর জমি বৃত্তি দেওয়া হইয়াছিল। (৯) গ্রামের পথঘাট পরিষ্কার করা ও অন্যবিধ কাজের জন্য ১৭ জন মেথরকে ১১ একর জমি দেওয়া হইয়াছিল। (১০) জমিদারবাড়িতে কাজকর্ম করার জন্য ১৩ জন বাউরির ভোগে ৫॥ একর জমি ছিল। (১১) উৎসবের দিনে জমিদারের কাছারিতে বাজনা বাজাইবার জন্য ২৫ জন বাজনদারকে ১৮ একর জমি দেওয়া হইয়াছিল। (১২) বিগ্রহের সামনে নৃত্যগীতের জন্য ৪টি নর্তকীকে ১ একর জমি দেওয়া হইয়াছিল। (১৩) ৩ জন মালিকে বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের সময়ে ফুল দিবার জন্য ২৯ পোল জমি দেওয়া হইয়াছিল। (১৪) জগন্নাথদেবের রথ টানিবার জন্য ২ জন লোকের ভোগে ৯৮ একর জমি ছিল। (১৫) গ্রামের গোরু চরাইবার জন্য একজনকে ১৯ পোল জমি দেওয়া হইয়াছিল। (১৬) মাধিয়া ব্রাহ্মণ নামে নিম্নশ্রেণীর ২ জন ব্রাহ্মণকে কোন কোন অনুষ্ঠানের জন্য ২ একর জমি দেওয়া হইয়াছিল।

গ্রামে সর্ববিধ কারিগর বা কাজকর্ম করিবার জন্য চাকর নিযুক্ত

রাখার ব্যবস্থা উড়িষ্যার মত ভারতবর্ষের সর্বত্রই প্রচলিত ছিল। যাহারা এইরূপ চাকরিতে নিযুক্ত থাকিত, তাহাদিগকে প্রতি গৃহস্থ স্বতন্ত্রভাবে বাৎসরিক বৃত্তি দিতেন। কোথাও এই বৃত্তি শস্যের আকারে, কোথাও নগদ, কোথাও বা পুরী জেলার মত চাষের জমি হিসাবে দেওয়া হইত; এবং প্রত্যেকে বংশানুক্রমে স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার চেষ্টা করিত।

মধ্যপ্রদেশে ওয়ার্ধার দক্ষিণে ইয়েওটমাল নামে একটি জেলা আছে। সেখানে প্রতি গ্রামে বংশপরম্পরায় চাকরি করিবার জন্য যে যে জাতি বসবাস করে, তাহাদিগকে নিম্নলিখিত হারে বাৎসরিক বৃত্তি দেওয়া হয়। এই বৃত্তিকে বলুতা বলে, বিদর্ভের অপরাংশে ইহার নাম হক। চাকুরিয়াদের মধ্যে কেহ কারিগর, কেহ ধর্মানুষ্ঠানে সহায়তা করে, কেহ বা গোরু চরানো, মেথরের কাজ ইত্যাদি করিয়া থাকে। সকল গ্রামে সব রকমের বৃত্তিধারী পাওয়া যায় না, তবে কামার, ছুতার, ধোপা, নাপিত ও মেথর বা কোটওয়াল প্রায় সকল গ্রামেই আছে। প্রতি যোতের জন্য কামার বৎসরে ৩২ হইতে ৬৫ সের জুয়ারি পায়; এক যোতে ১৬ হইতে ২০ একর জমি চাষ হয়। ছুতারের প্রাপ্য প্রায় ঐরূপ। নাপিত ২৫ হইতে ৪০; ধোপা ১৩ হইতে ১৬; কোটোয়াল ২৫ হইতে ৩২ সের পাইয়া থাকে। নিম্নশ্রেণীর চাকরেরা যাহা পায় তাহা দ্বারা কোনিও রকমে প্রাণ-ধারণ করা যায়; কিন্তু কারিগর বা পুরোহিত যাহা পায় তাহাতে তাহাদের স্বচ্ছন্দে সংসার নির্বাহ হইয়া থাকে।

১৮১২ খৃষ্টাব্দে বিলাতের পার্লামেণ্ট মহাসভায় ভারতবর্ষের অবস্থা সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দাখিল করা হয়, তাহাতে দেখা যায়, সে সময়েও মাদ্রাজ প্রদেশে গ্রামাঞ্চলে নিম্নলিখিত চাকুরিয়াদের বৃত্তি প্রচলিত ছিল:

(১) গ্রামের প্রধান, (২) হিসাবরক্ষক, (৩) চৌকিদার, (৪) সীমানা পরিদর্শক, (৫) জলাশয় এবং জল সরবরাহ করিবার জন্য নিযুক্ত কর্মচারী, (৬) পুরোহিত, (৭) পাঠশালার পণ্ডিতমহাশয়, (৮) জ্যোতিষী, (৯) কামার, (১০) ছুতার, (১১) কুমোর, (১২) ধোপা,

(১৩) নাপিত, (১৪) রাখাল, (১৫) বৈদ্য, (১৬) নর্তকী, (১৭) বাজনদার ও কবি।

পঞ্জাব প্রদেশে গুজরাট জেলায় গ্রামের বিভিন্ন বৃত্তিধারীকে শস্য দিবার ব্যবস্থা আছে। তিনগাছি খড় যত লম্বা হয়, ততখানি লম্বা দড়ি দিয়া যতখানি গম বা যবের গাছ বাঁধা যায়, তাহা এক গোছা বলিয়া গণ্য হয়। প্রত্যেকের জন্য এইরূপ কয়েক গোছা শস্য নির্দিষ্ট থাকে। গ্রামের কামার সকলের জন্য কাস্তে, কোদাল, লাঙলের ফাল মেরামত করে এবং নিয়মিত বৃত্তি পায়। গৃহস্থকে লোহা দিতে হয়, কাঠকয়লা কামার নিজে সংগ্রহ করিয়া আনে। কিন্তু কোন গৃহস্থের গাছ কাটা হইলে সেই গাছের শিকড় ও ডালপালা কামারের প্রাপ্য হয়। গ্রামের বাহিরের কোন আগন্তুক যদি কামারকে দিয়া কাজ করাইতে চায়, তবে তাহাকে লোহা, কয়লা, মজুরি সব জিনিসের দাম ধরিয়া দিতে হয়।

যুক্তপ্রদেশে বস্তি জেলায় খেবরুয়া নামে এক গ্রামে অনুসন্ধানের ফলে দেখা গিয়াছে, প্রতি হাল পিছু নাপিত, ধোপা, কামার, ছুতার ও রাখালকে চার পসেরি ওজনের ধান বা গম দিতে হয়। তাহা ছাড়া ধান ঝাড়ার কাজ শেষ হইলে প্রত্যেকে 'কল্যাণী' বাবদ কিছু পায়। উপরোক্ত চাকরগণ ছাড়া গ্রামের জ্যোতিষী পণ্ডিত, কাহার, সোখা অর্থাৎ ওঝা কিছু কিছু পাইয়া থাকে। ভাগচাষী ও জমিদারের মধ্যে শস্যের ভাগ হইবার আগে এইসকল পাওনা মেটানো হয়। তাছাড়া গ্রামে আগন্তুক ব্রাহ্মণ বা ফকিরের জন্য দুই হাতে আঁচলা করিয়া যতটা ধরে, সেইরূপ পাঁচ আঁচলা শস্য তুলিয়া রাখা হয়। ভাগচাষীর স্ত্রীও যতটা পারে ততটা তুলিয়া লইলে তাহার পর জমিদারের সঙ্গে সর্বশেষে চাষীর ভাগ হয়।

মেদিনীপুর জেলায় গড়বেতা অঞ্চলে এ ব্যবস্থা এখনও প্রচলিত আছে। নাপিত গৃহস্থের কাছে মাথাপিছু এক মান বা চার সের ধান পায়, তাহাকে সম্বৎসর প্রত্যেকের চুল কাটিয়া ও দাড়ি কামাইয়া দিতে হয়। কামার হাল পিছু দশ-বারো মান অর্থাৎ প্রায় আধ মণ ধান পায়। তাহাকে কাস্তে, কোদাল মেরামত করিতে হয়; কিন্তু নূতন কিছু গড়িতে হইলে আলাদা মজুরি দিতে হয়। ছুতার বা ধোপার পাওনা স্থির নাই; কাজ অনুসারে মজুরি পায়। কবিরাজ ঘর পিছু চার কুড়ি বা একমণ পাঁচ

সের ধান হইতে ছয় কুড়ি বা দেড়মণ ধান লন। ঔষধের দাম সচরাচর লওয়া হয় না। কিন্তু কঠিন রোগ হইলে ঠিকার বন্দোবস্ত করা হয়। যথা, বাতশ্লেষ্মা জ্বরের রোগীকে সারাইয়া তুলিবার জন্য হয়তো পাঁচ টাকায় রফা হইল; তখন ঔষধ তিনিই দিয়া থাকেন, সেজন্য পৃথক্ দাম লাগে না।

মেলা

ভারতবর্ষে যাহারা গ্রামের মধ্যে বসবাস করিত, তাহাদের প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য উপরোক্ত উপায়ে ভারতবর্ষের সর্বত্র বংশপরম্পরায় চাকুরিয়া বা শিল্পীদের বাঁধিয়া রাখিবার নানাবিধ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু এমন কিছু কিছু জিনিস আছে যাহা নিত্যপ্রয়োজন হয় না, অথচ যাহার জন্য বিশিষ্ট কারিগরগণকে গ্রামে বাঁধিয়াও রাখা যায় না। ধরুন, পিতল কাঁসার বাসনের কাজ। তাহা তো নিত্য খরিদ বা মেরামতের দরকার নাই; আর ছোটখাটো গ্রামের পক্ষে একজন করিয়া কাঁসারি পোষাও সম্ভব নয়। এমন অবস্থায় দুই তিন প্রকার ব্যবস্থা হইতে পারে। পশ্চিম বাঙলায় বিভিন্ন জেলায় কাঁসারিগণ গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ভাঙগা বাসনপত্র মেরামত করিয়া দেয়, অথবা একেবারে অচল হইলে সেগুলির বদলে বাকি দাম লইয়া গৃহস্থকে নূতন বাসন বিক্রয় করে। কোন কোন ক্ষেত্রে কাঁসারি এক গ্রামে কিছুদিনের জন্য থাকিয়া যায়; এমন কি পুরানো বাসন গলাইয়া হয়তো পিতলের ধান মাপিবার জন্য কুন্‌কের মত জিনিস ঢালাই করিয়াও দেয়। কিন্তু ইহা অপেক্ষা ভাল আর একটি খরিদ-বিক্রির ব্যবস্থা ভারতের সর্বত্র আজও প্রচলিত রহিয়াছে।

চাষীর দেশে সকল সময়ে ক্ষেতে ভারি কাজ থাকে না। যে সময়ে ফসল কাটা শেষ হইয়া যায়, শস্য বিক্রয়ের পর চাষীর হাতে কিছু পয়সা আসে, সেই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে মেলা বসে। ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত নানা জায়গায় কোনও ঠাকুর দেবতার পূজা-পার্বণ উপলক্ষে মেলা বসার রীতি প্রচলিত আছে। কোথাও বা দুই নদীর সঙগমস্থলে কোনও শুভ দিবসে স্নানের জন্য বহু মানুষের

সমাগম হয়। এইসকল মেলার মধ্যে, সকল মেলায় না হইলেও অন্তত অনেক মেলাতে, বিস্তর কেনাবেচার কাজ হয়। বিশেষ বিশেষ মেলায় বিশেষ বিশেষ জিনিস খরিদ-বিক্রয়ের প্রথা প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহার ফলে গৃহস্থ বুঝিয়া সুঝিয়া নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্য মেলা হইতে সংগ্রহ করিয়া আনে। সারা বৎসর কাজের পর সে যে কেবল মেলায় একটু আনন্দ উৎসব করিতেই যায় তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে বৈষয়িক ব্যাপারও কিছু সারিয়া আসে।

বরিশাল জেলার মধ্যে বাউফল থানার অন্তর্গত কালিশুঁড়ির মেলায় শুধু যে জেলার লোকই সমবেত হয় তাহা নহে, পার্শ্ববর্তী খুলনা, যশোহর প্রভৃতি জেলা হইতেও বহু লোক আসে। মেলায় ঘোড়া গোরু মহিষ বহু আমদানি হয়; তা' ছাড়া, ছোট বড় নানা আকারের প্রায় দশ হাজার নৌকা বিক্রয়ের জন্য আমদানি হয়। এইসকল নৌকার কারিগর ঢাকা জেলার ছুতার; তাহারা এক একজন দুই শ পর্যন্ত নৌকা এক সঙ্গে বাঁধিয়া জলপথে লইয়া আসে। সারা বৎসর তাহারা এই মেলায় বিক্রয়ের জন্য নৌকা নির্মাণ করে, এবং কালিশুঁড়ির মেলায় আসিয়া বহু জেলার লোকের নিকটে তাহা বিক্রয় করিয়া থাকে। তেমনই দিনাজপুর জেলায় নেকমর্দের মেলায় ও ঠাকুরগাঁর ওপারে জয়গঞ্জে কালির মেলায় বহু ঘোড়া কুকুর হাতী দুম্বা গোরুবাছুর এবং উট বিক্রয়ের জন্য আসিয়া থাকে। এত বড় মেলায় ঢাকা, ময়মনসিংহ, ধুবড়ি প্রভৃতি জেলা হইতেও অসংখ্য খরিদ্দার আসিয়া উপস্থিত হয়।

হিমালয়ের মধ্যে আলমোড়া জেলায় সরযূ ও গোমতী নদীর সঙ্গমস্থলে বাগেশ্বর মহাদেবের মন্দির। সেখানে প্রতি বৎসর মকর-সংক্রান্তি উপলক্ষে স্নানের জন্য প্রায় বিশ হাজার লোকের সমাগম হয়। কুমায়ুনী ও ভোটিয়া ভিন্ন যুক্তপ্রদেশের সমতলখণ্ডের বহু লোকও সেখানে উপস্থিত হয়। পাহাড়ী ভোটিয়াগণ সারা বৎসর নিজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে বসিয়া যে সকল কম্বল, শাল, গালচে প্রভৃতি তৈয়ারি করে তাহা বাগেশ্বরের মেলায় বেচিতে আসে। তাহাদের দেশে পাহাড়ের গায়ে ঘাস জন্মায় বলিয়া ভেড়া ছাগল এবং পাহাড়ী ঘোড়া পোষার সুবিধা হয়। এইসকল ঘোড়া পাহাড়ী পথে মাল লইয়া যাওয়া-আসার পক্ষে খুব

উপযোগী; বাগেশ্বরের মেলায় তাই পাহাড়ী জন্তুজানোয়ারের বিক্রয়ও যথেষ্ট হয়। ভোটিয়াগণ কম্বল এবং ভেড়া ছাগল ভিন্ন তিব্বত হইতে সংগ্রহ করা কস্তুরী, নানাবিধ জন্তুর চামড়া, সোরা, মোম, তিব্বতী ঔষধপত্রও বিক্রয়ের জন্য লইয়া আসে, এমন কি, তাহাদের নিকট বাসন ও তিব্বতী কাঠের কাজও কিনিতে পাওয়া যায়। দানপুর অঞ্চলের লোকে বাগেশ্বরের মেলায় নানাবিধ ঝুড়ি, বাক্স, পেঁটরা ছাড়া চামড়া, লোহা, তামা ও মাটির বাসন লইয়া আসে। এদিকে আলমোড়া জেলার ব্যবসায়িগণ আবার পাহাড়ীদের কাছে বিক্রয় করিবার জন্য নিম্নলিখিত জিনিসপত্র আমদানি করেঃ সুতী কাপড়, ছাতা, তৈল, নুন, চিনি, গুড়, শস্য; সাবান, আরসি, বোতাম, রুমাল, ঘড়ি, বাঁশি, তালা চাবি, তাস, রবার বা কাঁচকড়ার খেলনা, টিন ও এলুমিনিয়মের বাসন, টর্চ ইত্যাদি। পাহাড়ী স্ত্রীপুরুষ নিজেদের জিনিস বেচিয়া যে পয়সা রোজগার করে, তাহার অনেক অংশ এইসকল খেলো মনোহারী জিনিসের পিছনে নষ্ট করিয়া ফেলে।

বাগেশ্বরের মেলা পাহাড় অঞ্চলে হয় বলিয়া তাহাতে মাত্র দশ বিশ হাজার লোক ধরে, কিন্তু ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এরূপ মেলায় ইহা অপেক্ষা বেশি লোক বহু জায়গায় সমবেত হয়। এইরূপ কয়েকটি মেলার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। রাজপুতানায় আজমীর হইতে সাত মাইল দূরে পুষ্কর তীর্থে শীতের প্রথমাংশে সমগ্র রাজপুতানা হইতে অসংখ্য ঘোড়া বিক্রয়ের জন্য আমদানি হয় এবং ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ হইতে সে সময়ে খরিদ্দার সমবেত হয়। মহীশূর রাজ্যে কোলার জেলায় অবনী নামে এক গ্রামে ফাল্গুন মাসে রামলিঙ্গেশ্বর মন্দিরের মেলা প্রায় দশদিন ব্যাপিয়া চলিতে থাকে; সেখানে অন্তত বিশ হাজার গোরুবাছুর বিক্রয় হয়। মধ্যপ্রদেশে অমরাবতী জেলায় বদনেরার নিকটে কুণ্ডেনপুরের মেলা শীতকালে প্রায় এক মাস ধরিয়া থাকে এবং সেখানে অন্তত ষাট হাজার লোকের সমাগম হয়। সেখানে সব রকম জিনিসের কেনাবেচা হয়। বদনেরা হইতে ছয় মাইল দূরে ভিট্টকে গ্রামে ও ত্রিশ মাইল দূরে উম্বংগুয়াডাতে যে মেলা বসে সেখানেও কুণ্ডেনপুরের মত প্রধানত গোরু-বাছুর ছাড়া, লোহার সরঞ্জাম, গোরুর গাড়ি, পিতল কাঁসার বাসন,

ছেলেদের খেলনা বিক্রয় হয়। আগ্রা হইতে বিশ ক্রোশ দ‌ূরে যম‌ুনার ধারে বটেশ্বর মহাদেবের মেলা কার্তিক মাসের মাঝামাঝি আরম্ভ হইয়া প্রায় মাসখানেক থাকে, সেখানে অন‌ুমান এক লক্ষ লোকের সমাগম হয়। মেলায় অসংখ্য ঘোড়া, উট, গোর‌ুবাছ‌ুর, মহিষ, হাতী, গোর‌ুর গাড়ি বিক্রয়ের জন্য আসে। দিল্লীর কিছ‌ু উত্তর-পশ্চিমে ভদওয়ানা নামক স্থানে যে মেলা বসে তাহা হরিয়ানা জাতের গোর‌ুবাছ‌ুর বিক্রয়ের জন্য প্রসিদ্ধ। পঞ্জাবে রোহটাক জেলায় ঐর‌ূপ একটি মেলায় অন্তত পঞ্চাশ হাজার গোর‌ুবাছ‌ুর বিক্রয় হয়। য‌ুক্তপ্রদেশে ব‌ুদাউন জেলায় কাকোরা গ্রামে কার্তিক মাসে যে মেলা বসে তাহাতে অন্তত চার পাঁচ লক্ষ লোক আসিয়া উপস্থিত হয়। মেলায় ঘরের আসবাবপত্র, বাসনকোসন, জ‌ুতা, কাপড়চোপড় অপর্যাপ্ত পরিমাণে বিক্রয় হয়; প্রত্যেক জিনিসের জন্য মেলায় ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দিষ্ট আছে। মাদ্রাজে গ‌ুণ্ট‌ুর জেলায় কোটাপ্পাকোণ্ডা পর্বতে মাঘ মাসের মেলায় প্রায় ষাট হাজার লোক আসে। নিকটে থাল্লামালাই পর্বত; এবং মেলায় পাহাড়ী অঞ্চল হইতে বাঁশ, কাঠের গ‌ুঁড়ি অসংখ্য পরিমাণে বিক্রয়ের জন্য আমদানি হয়। য‌ুক্তপ্রদেশে লখনৌ এবং ফৈজাবাদের মধ্যে র‌ুদাউলিতে জোহ‌্রা বিবির দরগাতে জ্যৈষ্ঠ মাসের মেলায় অন্তত ষাট হাজার লোক আসে এবং সেখানে কাপড়চোপড় ছাড়া নানাবিধ শস্যের যথেষ্ট বিক্রয় হয়।

তীর্থস্থান

মেলায় যখন বহ‌ুলোকের সমাগম হয় তখন তাহা একটি ক্ষ‌ুদ্র শহরে পরিণত হয়। কিন্তু শহর হইলেও ইহা অস্থায়ী। এইর‌ূপ মেলার কেন্দ্রে অনেক দিন ধরিয়া ব্যবসাবাণিজ্য চলিতে থাকিলে তাহা ক্রমশ স্থায়ী শহরে পরিণত হয়। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে অসংখ্য তীর্থস্থান আছে। হিন্দ‌ুধর্মের মধ্যে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি প্রতি সম্প্রদায়ের যেমন বিশেষ বিশেষ তীর্থ আছে, ম‌ুসলমানদের তীর্থের সংখ্যাও তেমনই কম নয়। বৈষ্ণবদের দ্বাদশ মহাতীর্থ, শাক্তগণের একান্ন পীঠস্থান, প্রাচীনকালে সৌর সম্প্রদায়ের সাতটি বিখ্যাত ক্ষেত্র ছিল। এবং এইসকল তীর্থের

বিশেষত্ব হইল, এগুলি ভারতবর্ষের কোনো একটি বিশেষ প্রান্তে সীমাবদ্ধ নয়, সকল প্রদেশে ছড়াইয়া আছে। কেহ যদি চার ধাম দর্শন করিতে চায় তবে তাহাকে উত্তরে বদরিকাশ্রমের নিকটে যোশীমঠ, পূর্বে শ্রীক্ষেত্র, পশ্চিমে গুজরাটে সারদাপীঠ এবং দক্ষিণে মহীশূরে কাডুর জেলায় শৃঙ্গেরী মঠে যাইতে হইবে।

আর প্রায় সকল তীর্থেরই বিশেষত্ব হইল যে, সেখানে তীর্থযাত্রী ধনীই হউক অথবা দরিদ্রই হউক, তাহাকে কিছু-না-কিছু সংগ্রহ করিয়া আনিতে হয়। পুরী বা শ্রীক্ষেত্রে তীর্থযাত্রীরা জগন্নাথের পট, নরম পাথরের উপর খোদাই করা জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রার মূর্তি, কাঁসার বাসন, দক্ষিণী শাড়ি প্রভৃতি খরিদ করে। কাশীতে পাথরের কাজ, দামী রেশমের কাপড়, কাঠের খেলনা, পিতল-কাঁসার বাসন ইত্যাদি পাওয়া যায়। বৃন্দাবনে ছাপাকাপড়, বাসনপত্র সংগ্রহ করা যাইতে পারে। শুধু যে অবস্থাবিশেষে তীর্থযাত্রিগণ জিনিসপত্র খরিদ করে তাহা নয়, তীর্থকৃত্য হিসাবেও এ বিষয়ে কতকগুলি বিধি আছে। গরিব হিন্দুস্থানি যাত্রীরা পুরী তীর্থে আসিয়া দু চার পয়সার লাল রং-করা বেতের ছড়ি লইয়া যায়; আবার সেই বেতের ছড়ি বৃন্দাবনে যমুনার ধারে একটি মন্দিরে জমা দিয়া থাকে। যেসকল যাত্রী বদরিকাশ্রমে যায় তাহারাও সেখানকার মন্দিরের পতাকার ছিন্ন অংশ সংগ্রহ করিয়া বৃন্দাবনের ঐ মন্দিরেই জমা দেয়। অর্থাৎ তীর্থযাত্রা সম্পূর্ণ করিতে হইলে ভারতের নানা স্থান হইতে কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া আনিতে হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে যেমন পরিচয় ঘটে, তেমনই সেসকল স্থানে নানাবিধ ছোট-বড় শিল্প যাত্রীদের আশীর্বাদে বাঁচিয়া যায়।

প্রায় প্রতি তীর্থই এইরূপে কোন-না-কোন বিশেষ শিল্পের জন্য খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। গ্রামে বসিয়া শিল্পী যত খরিদ্দার পায়, তাহা কখনও সংখ্যায় বেশি হইতে পারে না। কিন্তু তীর্থাশ্রয়ী শিল্পী বা কারিগরের খরিদ্দার সারা ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া ছড়াইয়া থাকে। আর তীর্থ-স্থানে বারো মাসে তের পার্বণ তো লাগিয়াই আছে; ফলে মেলায় বিক্রয়ার্থ কারু বা শিল্পীর সহিত যেমন বছরের ভিতর অল্পদিনের জন্য খরিদ্দারের যোগ হয়, তীর্থস্থান সেরূপ নহে। সেখানে বারো মাস মেলা

লাগিয়া থাকার ফলে বহু শিল্পী, বহু কারিগরের পক্ষে একস্থানে ব্যবসায় চালানো সম্ভব হয়। কাশী বা পুরীর মত প্রাচীন ক্ষেত্রে শহরের এক এক পল্লী বিশেষ বিশেষ শিল্পের জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছে। কোথাও পাথরের কাজ হয়, কোথায় কাপড়ে রং করা বা ছাপানোর কাজ হয়, কোথায় সোনারূপা বা জরির তারের কাজ হয়, কোন পল্লীতে পটুয়া বা মাটির খেলনার কারিগরের বাস আছে। এইরূপে মেলার মধ্যে আমরা অস্থায়ী আকারে যাহা দেখিতে পাই, ভারতবর্ষের বিভিন্ন তীর্থকেন্দ্রগুলিতে তাহাই স্থায়ী আকার ধারণ করিয়াছে।

ভারতের সংস্কৃতিগত ঐক্য

তীর্থস্থানগুলিতে নানা প্রদেশ হইতে সমবেত হইয়া যাত্রিগণ যে শুধু কিছু জিনিসপত্র সংগ্রহ করিয়া বাড়ি ফিরিয়া যায় তাহা নহে, সেখানে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের অধীনে স্নান, তর্পণ, দান প্রভৃতি নানা ধর্মানুষ্ঠানের দ্বারা তাহারা পুণ্যার্জনেরও চেষ্টা করে। বাঙালী তীর্থযাত্রী নর্মদার কূলেই হউক, অথবা গোদাবরী, কাবেরীর তটেই হউক, কিংবা গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম বা অলকানন্দা ভাগীরথীর সঙ্গমেই হউক, একই সংস্কৃত ভাষায় মন্ত্র, একই অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া ভারতের সকল ক্ষেত্রকেই আপন বলিয়া বিবেচনা করিতে শেখে। শুধু রাজার শাসনের জোরে নয়, বরং অসংখ্য যাত্রী বহু যুগ ধরিয়া তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করার ফলে ভারতের সর্বত্র সংস্কৃতিগত ঐক্যের একটি ভাব ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে। একই রামায়ণ, মহাভারত, একই পুরাণ কাহিনী ব্রাহ্মণশাসিত ভারতবর্ষের চিত্তকে স্পর্শ করিয়া থাকে। হিন্দুধর্মের সহিত সন্ন্যাসাশ্রমের এক অঙ্গাঙ্গি যোগ বর্তমান রহিয়াছে। পূর্বে দ্বিজাতীয় গৃহস্থ সংসারযাত্রা নির্বাহ করিবার পর বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন। কিন্তু বুদ্ধদেব এবং শঙ্করাচার্যের পর হইতেই বোধ হয় সম্প্রদায় হিসাবে সন্ন্যাসীর উদয় হইল। সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে সন্ন্যাসীর সহিত পূর্বাশ্রমের সকল যোগ ছিন্ন হয়। অর্থাৎ তাঁহার নাম গোত্র গৃহাদি পরিচয় লুপ্ত হইয়া যায় এবং তিনি নিকেতনবিহীন, নামগোত্রহীন

অবস্থায় উপনীত হন। হিন্দী ভাষায় একটি প্রবাদ আছে—'বহতা পানি চলতা সাধু' শ্রেষ্ঠ; অর্থাৎ যে জল বহিয়া যায় সেই জল ভাল, যে সাধু কোথাও বাসা বাঁধেন না, তিনি শ্রেষ্ঠ। সাধু সন্ন্যাসী তীর্থে তীর্থে, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, এক রাজার অধিকার অতিক্রম করিয়া অপর রাজার রাজ্যে যাতায়াত করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে সংস্কৃতিগত ঐক্য আংশিকভাবে স্থাপনা করিয়াছিলেন, ইহা সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই।

অর্থনৈতিক আদর্শের সম্বন্ধে একটি বিচার

সমগ্র ভারতবর্ষে গ্রামের আর্থিক জীবন পরিচালনা করিবার ভার কারিগর, শিল্পী, চাষী জাতিবৃন্দের উপরে ন্যস্ত ছিল। গ্রামের প্রয়োজন অনুসারে সকলে উৎপাদন করিত। পরস্পরের মধ্যে প্রাপ্য, অর্থ বা শস্যের সহায়তায় মেটানো হইত। সকলেই পরস্পরের উপরে নির্ভর করিয়া চলিত। এমনও দেখা গিয়াছে, যদি কোন কারিগরের সহিত এক গৃহস্থের বিবাদ উপস্থিত হয়, তখন গ্রামের আর পাঁচজন মিলিয়া সেই বিবাদ মিটাইবার চেষ্টা করে। আর্থিক ব্যাপারের জন্য ব্যবসা পরিবর্তন করিবার স্বাধীনতা যেমন স্বীকৃত হইত না, সকলকেই কৌলিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া চলিতে হইত, তেমনই আবার গ্রামের কোন কারিগর অন্নাভাবে কষ্ট না পায় ইহাও গ্রামের পাঁচজন দেখিবার চেষ্টা করিত।

ভারতীয় সমাজগঠনের মধ্যে সমবায় বা সহযোগিতার এই আদর্শের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কেহ কেহ প্রাচীন ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্রবাদ প্রচলিত ছিল, এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক আদর্শের সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্টতর করিবার জন্য এ বিষয়ে কিছু বিচারের প্রয়োজন আছে। তদুপরি পুস্তকের পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে যখন ভারতীয় সমাজের বিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে, তখন বর্তমান আলোচনার ফলে আমাদের পথ আরও সুগম হওয়া সম্ভব।

কোন এক গ্রন্থকার ভারতবর্ষের প্রাচীন যৌথ পরিবারকে আদর্শ সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি এমনও বলিয়াছেন যে, যৌথ পরিবারের আদর্শকে সমাজতন্ত্রবাদের ভারতীয় সংস্করণ বলিয়া

বিবেচনা করা যাইতে পারে। হয়তো একটি পরিবারের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বেচ্ছায় স্বার্থসঙ্কোচের দ্বারা আর্থিক অধিকারে সাম্যের ভাব আনিতে পারে, কিন্তু এরূপ ব্যবস্থার দ্বারা সমগ্র দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সাম্য কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়? রক্ত বা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ কয়েকজন ব্যক্তির মধ্যে যাহা সম্ভব, বহুর ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব নাও হইতে পারে; অন্তত প্রাচীন ভারতে সেরূপ সাম্যের কোন আদর্শ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কখনও দেখা যায় নাই। হিন্দুসমাজের মধ্যে কোন কালে কামার, কুমোর, স্যাকরা, ব্যবসায়ী বা চাষী, শিক্ষক, অধ্যাপক সকলকে লইয়া সমতাসম্পন্ন যৌথ পরিবার সৃষ্টির চেষ্টা হইয়াছিল, ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে মনুসংহিতা বা মহাভারত প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ পড়িলে একটি আশ্চর্য বিষয় পরিলক্ষিত হয়। ব্রাহ্মণকে সমাজের মধ্যে অত্যুচ্চ সম্মান এবং অধিকার দিলেও তাঁহাদিগকে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করিতে বলা হইত। তদ্ভিন্ন অপরাপর ধনীও যাহাতে সাধারণের উপকারে অর্থব্যয় করে, মন্দির পথঘাট নির্মাণ করিয়া দেয় বা কূপ-তড়াগাদি খনন করায়, সেইজন্য এরূপ কাজকে বিশেষ পুণ্যের কাজ বলিয়া গণনা করা হইত। বর্তমান সময়ে ট্যাক্সের সাহায্যে ধনীর অধিকার হইতে টাকা আদায় করিয়া রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রের অধীন মিউনিসিপ্যালিটি সাধারণের প্রয়োজনীয় কাজে যেভাবে অর্থব্যয় করেন, প্রাচীন ভারতবর্ষে সেরূপ ব্যবস্থা ছিল না। তাহার পরিবর্তে স্বর্গের লোভ দেখাইয়া, অথবা সমাজে সম্মানের আকর্ষণের সাহায্যে ধনীদিগকে সৎকাজে অর্থব্যয় করিবার প্ররোচনা দেওয়া হইত। অর্থাৎ আইনের বশে না ফেলিয়া বরং পুণ্যের আকর্ষণে ধনবৈষম্যের দোষ কতকাংশে কাটানো হইত। কিন্তু কেহ স্বীয় ধনসম্পদ সৎকার্যে ব্যয় করিতে না চাহিলে, রাষ্ট্র বা সমাজ তাহাকে বাধ্য করিতে পারিত না। নিজের আয়ের মালিক মানুষ নিজেই ছিল, তদুপরি ধনোৎপাদনের সরঞ্জামের উপরে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্বও স্বীকৃত হইত। সেগুলিকে রাষ্ট্রের বা সর্বজনের সম্পত্তি করিবার চেষ্টা, অথবা সকলের মধ্যে আর্থিক অধিকারে সমতা সম্পাদনের আদর্শ প্রাচীন ভারতবর্ষে ছিল না। অতএব হিন্দুসমাজ-সংগঠনের ব্যাপারে সাম্যবাদের আদর্শ বর্তমান ছিল, এরূপ অনুমান করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।

আর্থিক সাম্যের ভাব না থাকিলেও ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল হইতে গ্রামে কৃষি এবং শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া এবং সকল বৃত্তিতে যথাসম্ভব কৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া এমন এক অর্থনৈতিক ও সামাজিক শাসনতন্ত্র রচনা করা হইয়াছিল যাহা বহু শতাব্দীর ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যেও মানুষকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে এবং দুর্যোগের মধ্যেও বাঁচিয়া থাকিবার আশ্বাস দিয়াছে। বিভিন্ন জাতিবৃন্দের মধ্যে ও বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে মর্যাদার অসমতা থাকা সত্ত্বেও খাওয়াপরার সম্পর্কে সকলে মোটামুটি নিশ্চিন্ত থাকিত বলিয়া এবং স্বীয় লোকাচার, কুলাচার বা দেশাচার বিনা বাধায় পালন করিবার স্বাধীনতা ভোগ করিত বলিয়া সাধারণ মানুষ সমাজের উপরে ব্রাহ্মণের আধিপত্যের বিরুদ্ধে আপত্তি করিত না। ব্রাহ্মণশাসিত আর্যসমাজ লোকধর্মের স্বাধীনতা স্বীকার করিত বলিয়া আগন্তুক জাতিবৃন্দ আনন্দচিত্তে হিন্দুসমাজের অভ্যন্তরে প্রদত্ত স্থান স্বীকার করিয়া লইত।

ব্রাহ্মণদের দ্বারা শাসিত সমাজে কোল জুয়াঙগদের সমাজ অপেক্ষা আর্থিক সচ্ছলতা ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মূলত তাহার আকর্ষণে এবং স্বীয় লোকাচার সমূলে পরিহার করিতে হইবে না, এই আশ্বাসে কোল জুয়াঙগ উরাঁও প্রভৃতি জাতিকে আমরা ধীরে ধীরে স্বীয় স্বাধীনতা পরিহার করিয়া ব্রাহ্মণ্য সমাজের দিকে আকৃষ্ট হইতে দেখি।

হিন্দুসমাজদেহের মধ্যেও মর্যাদা ও মনুষ্যত্ব বিকাশের সুযোগ-সুবিধার তারতম্য মোটের উপরে উপেক্ষা করিয়া সেই একই কারণে বিভিন্ন জাতি পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার বন্ধন বহু শতাব্দী ধরিয়া অক্ষত অবস্থায় টিঁকাইয়া রাখিয়াছিল। রাজনৈতিক গগনে শাসকের পর শাসকের উদয় হইয়াছে, দেশে বিদ্রোহ, বিপ্লব, দুর্ভিক্ষ, মহামারী বারংবার দেখা দিয়াছে, তবু জীবনের ভারকেন্দ্র গ্রাম্য সমাজের অর্থনীতি ও সমাজনীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া মানুষ গ্রামের শাসন এবং কৌলিক বা জাতিগত আইনের শৃঙখলার জোরে এইসকল আগন্তুক আঘাতকে বার বার উপেক্ষা করিয়া জীবনের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। হয়তো বাহিরের আঘাতের সংখ্যাধিক্যে তাহাদের উন্নতি বা

অগ্রগতি প্রতিহত হইয়াছে, কিন্তু আগন্তুক আঘাত ভারতবর্ষের মানুষকে বর্বরতার পঙ্কে ঠেলিয়া নামাইতে পারে নাই। এই শক্তি ছিল বলিয়া অন্তরের বহুবিধ দুর্বলতা সত্ত্বেও ভারতীয় সমাজব্যবস্থাকে আশ্রয় করিয়া ভারতের সংস্কৃতি আজও জীবন্ত অবস্থায় বাঁচিয়া আছে, তাহার উন্নতি অথবা নবজন্মলাভের সম্ভাবনা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কোন কোন দেশের সভ্যতার মত তিরোহিত হয় নাই।

অষ্টম অধ্যায়

বর্ণব্যবস্থার প্রাচীন ইতিহাস

বেদের রচনাকাল লইয়া অনেক তর্কবিতর্ক হইয়াছে। বৈদিক সংস্কৃতি পরিণত অবস্থায় পৌঁছিবার পর আর্যভাষাভাষী জাতিবৃন্দ ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, অথবা সে পরিণতি ভারতবর্ষের মধ্যেই সংঘটিত হইয়াছিল; মূল আর্যভাষী জাতিসমূহের খাওয়াপরা, সমাজ-ব্যবস্থা ও সংস্কৃতি কিরূপ ছিল, এসকল বিষয় লইয়া নানাদিক দিয়া পণ্ডিতগণ গবেষণা করিয়াছেন। কিন্তু উপস্থিত তাহা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। বৈদিক কালে উত্তর ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো কি আকার ধারণ করিয়াছিল এবং পরবর্তীকালে তাহার কেমন পরিণতি ঘটিয়াছিল ও সেই পরিণতির হেতুই বা কি, ইহার ইতিহাস আমাদিগকে যথাসম্ভব উদ্ধার করিতে হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এসম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য প্রমাণের পরিমাণ নিতান্ত অল্প। ছিন্নভিন্ন পুস্তকের পাতা ঝোড়ো হাওয়ায় উড়িয়া গেলে, তাহার অসংলগ্ন দুই চারিটি পাতা খুঁড়িয়া যেমন পুস্তকের বিষয়বস্তুর সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণা জন্মে, আমাদের চেষ্টার ফলও তাহা অপেক্ষা বেশি কিছু হইবে না।

বৈদিক সাহিত্যে আর্য বা শিষ্টগণের সঙ্গে অরণ্যচারী জাতিবৃন্দের কিছু কিছু দ্বন্দ্বের পরিচয় পাওয়া যায়। যেসকল আদিম অধিবাসীর সঙ্গে আর্যগণের সংস্পর্শ হইত, তাহাদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে তাহারা 'ঘোর' অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ; তাহারা 'অনাস'। হয়তো কৃষি ও গোপালন-জীবী জাতিবৃন্দের তুলনায় বনচারী ব্যাধজাতি সমূহের নাসিকা খর্বকায়, অর্থাৎ লম্বার তুলনায় চওড়া বেশি বলিয়া এইরূপ মনে হইয়া থাকিবে। আর্যগণ অরণ্যচারী এইসকল জাতিকে ভয় করিতেন। তাহারা আসিয়া ঋষিগণের যজ্ঞভূমিতে উৎপাত করিত, এবং ঋষিগণও

রক্ষার নিমিত্ত ক্ষত্রিয়গণের শরণাপন্ন হইতেন, আমরা রামায়ণের কাহিনী পাঠ করিয়া তাহা অবগত হইতে পারি।

কিন্তু আর্যসমাজের আভ্যন্তরীণ গঠন কেমন ছিল তাহা আমাদের বিশেষ জানা নাই। পরবর্তীকালে বিভিন্ন বৃত্তিগুলিকে যেমন একান্তভাবে কুলবিশেষ অথবা জাতিবিশেষের আয়ত্তাধীন করিবার চেষ্টা দেখা যায়, এ সময়ে তাহার নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু বেদের বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন পুরোহিতবংশের আয়ত্তাধীন করা হইয়াছিল, ইহা আমরা অতি প্রাচীন কাল হইতেই দেখিতে পাই। এই আদর্শের অনুকরণেই পরে শিল্পবৃত্তিগুলিকেও কৌলিক বা জাতিগত করা হইয়াছিল বলিয়া কোনো কোনো পণ্ডিত অনুমান করিয়াছেন। যাহাই হউক, বৈদিক যুগে কিন্তু শিল্পবৃত্তি সম্পর্কে স্বাধীনতার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ভৃগু ঋষি মন্ত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার বংশধরগণের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তাঁহারা রথনির্মাণে দক্ষ ছিলেন।

শ্রমবিভাগের ফলস্বরূপ সমাজের মধ্যে চাষী, গোপালক, বায় (অর্থাৎ তন্তুবায়), কামার, ছুতার, চামার, নাপিত, ভিষক, বণিক প্রভৃতির নামও পাওয়া যায়। কিন্তু এই সকল বৃত্তি কুলগত ছিল কিনা, অথবা বিভিন্ন শিল্পিগণের মধ্যে সামাজিক আসনের তারতম্য ছিল কিনা তাহা স্পষ্টত বলা যায় না।

একটি বিষয়ে কিন্তু আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা নিতান্ত প্রয়োজন। যে আর্থিক ব্যবস্থা বা ধনতন্ত্র বৈদিক কালে গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার ফলে দেশের সকলের দারিদ্র্য অথবা দারিদ্র্যের সম্ভাবনা ঘোচে নাই। কেননা বৈদিক সাহিত্যে ভিক্ষুকের উল্লেখ আছে এবং মন্ত্রের মধ্যে ইন্দ্র অথবা আদিত্যগণকে উদ্দেশ্য করিয়া এমন প্রার্থনাও রহিয়াছে যেন তাঁহারা সতত ভক্তগণকে দারিদ্র্য এবং দুর্ভিক্ষের কবল হইতে রক্ষা করেন। অবশ্য দুর্ভিক্ষ যেমন সমাজব্যবস্থার দোষে ঘটিতে পারে, তেমনই প্রাকৃতিক দুর্যোগের বশেও ঘটিতে পারে। ছান্দোগ্য উপনিষদে পঙ্গপালের অত্যাচারে শস্যনাশের কাহিনী আছে। ইহার ফলে চক্রায়ন নামে জনৈক ঋষি সস্ত্রীক দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বেই বেদের ব্রাহ্মণাংশের রচনা সমাপ্ত

হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়া থাকেন। তখন ভারতবর্ষে যথেষ্ট ঐশ্বর্য সংগৃহীত হইয়াছিল। বিদর্ভ, কোশল, কাম্পিল, অসন্ধিবৎ, পরিচক্র প্রভৃতি শহরের নাম পাওয়া যায়। অর্থাৎ দেশের সম্পদ বৃদ্ধি পাইয়া এক এক ঘনীভূত লোকালয়ে জমিয়া উঠিতেছিল, ইহা আমরা অনুমান করিতে পারি। কিন্তু এই সকল শহরের বিস্তার কিরূপ ছিল, কত লোকই বা সেখানে বসবাস করিত, সেগুলির সঙ্গে গ্রামের আর্থিক সম্বন্ধ কেমন ছিল, তাহা জানিবার উপায় পাওয়া যায় না। বৈদিক কালের কোনও নগরের ধ্বংসাবশেষ আজও নিঃসন্দিগ্ধরূপে আবিষ্কৃত হয় নাই। যদি তেমন নগর পাওয়া যায়, এবং বৈজ্ঞানিক আদর্শে তাহার খননকার্য পরিচালিত হয়, তবে আমরা সম্ভবত সে সময়ে জীবনের সম্বন্ধে নূতন জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইব।

মোহেন-জো-দড়ো

স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সিন্ধুদেশে মোহেন-জো-দড়ো নামক স্থানে সর্বপ্রথম সিন্ধুসভ্যতার বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। ভারত গভর্মেণ্টের পুরাতত্ত্ব বিভাগ বহুদিনব্যাপী চেষ্টার ফলে ঐ সভ্যতার সম্বন্ধে বহু তথ্য আবিষ্কার এবং প্রকাশ করিয়াছেন। মোহেন-জো-দড়োতে যেসকল লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার পাঠ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ এখনও কোন স্থিরসিদ্ধান্তে পেঁীছিতে পারেন নাই। সিন্ধুসভ্যতার কাল লইয়া এবং উদ্ভবকেন্দ্র ও অপরাপর দেশের সহিত তাহার সম্পর্ক সম্বন্ধে মোটামুটি কতকগুলি সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে। কিন্তু সেই সভ্যতার সহিত আর্য বা বৈদিক সংস্কৃতির কোন যোগ ছিল কিনা, পরবর্তী কালের হিন্দুসমাজের সহিত তাহার সম্বন্ধই বা কি, তাহা আজও অজ্ঞাত রহিয়াছে। এমন অবস্থায়, হিন্দুসমাজের ইতিহাস আলোচনাকালে সিন্ধুসভ্যতাকে বাদ দেওয়াই ভাল। অনুসন্ধিৎসু পাঠক ইচ্ছা করিলে শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গোস্বামী প্রণীত বাঙলা পুস্তক বা ম্যাকে সাহেবের সংক্ষিপ্ত ইংরেজী পুস্তক পড়িয়া উহার সম্বন্ধে মোটামুটি সংবাদ জানিতে পারিবেন।

বুদ্ধদেবের সময়

প্রাচীন ভারতবর্ষের ধনতন্ত্রের সম্পর্কে যে অস্পষ্ট আভাস দেওয়া গেল, পরবর্তী কালে, অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের সময়ে আসিয়া আমরা তাহার আরও খুঁটিনাটি পরিচয় পাই। বুদ্ধদেব আচারসর্বস্ব ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া ধর্মের সনাতনবস্তুর উপরে জনসমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের কুলগত অধিকারস্বরূপ মর্যাদা-ভিক্ষার প্রতিবাদে তিনি বহু উক্তি করিয়াছিলেন। সেগুলি ধম্মপদগ্রন্থে উত্তরকালে সন্নিবেশিত হইয়াছিল। বুদ্ধদেব বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন :

জটাজুট পরিধান দ্বারা, গোত্রদ্বারা এবং জাতিদ্বারা ব্রাহ্মণ হয় না, কিন্তু যিনি চারি আর্য সত্য ষোড়শ প্রকারে দর্শন করিয়াছেন ও নব লোকোত্তর ধর্ম পরিজ্ঞাত — তিনি শুচি এবং তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। ২৬।১১

হে দুর্বুদ্ধে! তোমার জটাজুট এবং মৃগচর্মে ফল কি? তোমার অভ্যন্তর (রাগাদি ক্লেশরূপ গহন দ্বারা) পরিপূর্ণ, তুমি বাহ্যশরীর কেবল পরিমার্জ্জিত করিতেছ। ২৬।১২

ব্রাহ্মণ জাতিতে উৎপন্ন হইলে কিংবা ব্রাহ্মণ-পত্নী-গর্ভজাত হইলে আমি তাহাকে ব্রাহ্মণ বলি না, কারণ, সে যদি রাগাদি মলে মলিন হয়, তাহা হইলে কেবল ভোবাদী হইবে। (অর্থাৎ, হে মহাশয়, আমি ব্রাহ্মণ—এইরূপ কথনশীল হইবে); কিন্তু (যিনি) আসক্তিরহিত এবং নিষ্পাপ তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি। ২৬।১৪

যাঁহার কায় মন ও বাক্যে পাপ নাই, যিনি এই ত্রিস্থানে অতিশয় সংযমশীল, সেই লোককে আমি ব্রাহ্মণ বলি। ২৬।৯

যিনি কর্কশতা পরিত্যাগ করিয়া সর্বদা সত্য কথা বলেন ও সদুপদেশ দেন এবং কাহাকেও বৃথা বিষয়ে লিপ্ত করেন না, তাঁহাকে আমি ব্রাহ্মণ বলি। ২৬।২৬

যিনি প্রগাঢ় জ্ঞানী, মেধাবী, সত্যাসত্য পথের সূক্ষ্মদর্শী এবং যিনি উত্তমপদ (নির্ব্বাণ) লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে আমি ব্রাহ্মণ বলি। ২৬।২১

বৈরীদিগের মধ্যে যিনি বৈরীশূন্য এবং দণ্ডবিধানকারীর মধ্যে যিনি শান্ত এবং সংসারাসক্তদিগের মধ্যে যিনি বন্ধনমুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি। ২৬।২৪

এই জগতে যিনি তৃষ্ণালতা ছেদন করিয়া অনাগারিক হইয়া বিচরণ করেন, যিনি তৃষ্ণালতা ও ভবস্রোতকে ক্ষীণ করিয়াছেন, তাঁহাকে আমি ব্রাহ্মণ বলি। ২৬।৩৪

যে নর পদ্মপত্রে জলবিন্দুর ন্যায় এবং সূচ্যগ্রে স্থিত সর্ষপের ন্যায় কামক্লেশে লিপ্ত নয়, তাঁহাকে আমি ব্রাহ্মণ বলি। ২৬।১৯

ব্রাহ্মণের বৃত্তি এবং ব্রাহ্মণত্বের মর্যাদা ব্যক্তিগত চরিত্র বা গুণের উপরে নির্ভর না করিয়া জন্মগত হওয়ার কারণেই বুদ্ধদেবের উপরোক্ত প্রতিবাদ। কিন্তু তাঁহার সময়ে শিল্পবৃত্তিগুলিও আংশিকভাবে কুলগত অধিকারে আসিয়া গিয়াছিল, ইহা অনুমান করিবার কারণ আছে। নিষাদ, চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ এবং দস্যুদের জন্য স্বতন্ত্র পল্লীর ব্যবস্থা ছিল। চণ্ডাল জাতিকে অতি হীন বলিয়া বিবেচনা করা হইত এবং পথের আবর্জনা পরিষ্কার করা ও রাত্রে গ্রাম পাহারা দেওয়া তাহাদের কৌলিক বৃত্তি বলিয়া গণ্য হইত। চণ্ডালের পাক করা খাদ্য দূরে থাক, তাহাকে ছুঁইলেও মানুষ অশুচি হইত। হীনশিল্পের মধ্যে নলকার, কুম্ভকার, চর্মকার এবং নাপিত গণ্য হইত। তবে শিল্প ব্যাপারে কৌলিক একাধিপত্য কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা সঠিক জানা যায় না। কুশ-জাতকে এক রাজপুত্রের কাহিনী আছে, তিনি পর পর কুম্ভকার, মালাকর প্রভৃতির অধীনে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। এমন হইতেও পারে, রাজ-পুত্রের যে স্বাধীনতা ছিল, সাধারণ মানুষের তাহা ছিল না। অথবা সাধারণ স্তরেও হয়তো বৃত্তিতে কৌলিক আধিপত্য একান্ত বাঁধাবাঁধি-ভাবে তখন পর্যন্ত স্থাপিত হয় নাই।

বুদ্ধদেবের সময়ে আরও একটি বিষয়ে আমরা নূতন ইঙ্গিত পাই। বারাণসীর নিকটে এক পল্লীতে পাঁচ শ কুমোর বাস করিত বলিয়া জানা যায়। অপর এক জাতকে এক হাজার কামারের দ্বারা অধ্যুষিত পল্লীর কথা আছে। এইসকল কর্মারগণের সমাজে একজন জেঠ্ঠক অথবা পমুক্‌খ, অর্থাৎ মাতব্বরের বিষয়ও উল্লিখিত হইয়াছে। এইসকল শিল্পী বা কারু স্বীয় কৌলিক বৃত্তি অনুসরণ করিয়া চলিত এবং ঐ বৃত্তির সঙ্গে সম্পর্কিত গণ, পূগ অথবা শ্রেণীর শাসন মানিয়া চলিত।

ব্যবসায় ও শিল্পে উন্নত ভারতবর্ষ

বিভিন্ন শিল্পবৃত্তির উপরে কৌলিক অথবা জাতিগত একচেটিয়া অধিকার স্বীকার করিয়া এবং গ্রাম, মেলা, নগর ও তীর্থস্থানসমূহকে আশ্রয় করিয়া সম্পদ উৎপাদন এবং বণ্টনের যে ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার ফলে সমসাময়িক অপর বহু দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষ সমৃদ্ধিশালী হইতে সমর্থ হইয়াছিল। আজ ইংলণ্ড জার্মানি বা আমেরিকা শিল্পে অগ্রণী; পুরাতন কালে ভারতবর্ষ এবং চীনদেশও তেমনই অপর দেশের তুলনায় শিল্পে জগতের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল।

সেই উন্নত শিল্পব্যবস্থার ফলে যাহা উৎপাদন হইত, তাহার কিয়দংশ বিদেশে রপ্তানি হইত। প্রাচীন ঐতিহাসিক বিবরণে আমরা দেখিতে পাই, ভারতবর্ষ একদিকে যবদ্বীপ, আনাম, চীন এবং অপর দিকে ব্যাবিলন ও রোমক সাম্রাজ্যের সহিতও বাণিজ্যসূত্রে গ্রথিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে কনিষ্ক যেসকল মুদ্রা প্রচলিত করিয়াছিলেন, তাহাতে গ্রীক, ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপি অঙ্কিত হইত। কণিষ্কের সাম্রাজ্য ভিন্ন ভারতের বাহিরেও নিশ্চয়ই সেই সকল মুদ্রার চলনের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল। 'পেরিপ্লাস অফ দি এরিথ্রিয়ন সী' নামক গ্রন্থ পাঠ করিলে জানা যায়, ভারতের বিভিন্ন বন্দর হইতে পশ্চিম দেশে নানাবিধ মশলা, কাপড়, হাতীর দাঁত, মুক্তা প্রভৃতি রপ্তানি হইত। গঙ্গাতীরবর্তী প্রদেশ হইতে অতি সূক্ষ্ম সূতী কাপড়ও চালান যাইত। আর তাহার বিনিময়ে বাহির দেশ হইতে মদ, তামা, রাং, সীসা, কাঁচা সোনা ও রূপার মুদ্রা, এমন কি সুন্দরী যুবতী এবং সঙ্গীতকুশল বালকদেরও আমদানি হইত।

পেরিপ্লাস আনুমানিক খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে লেখা হয়।

শিল্প ও বাণিজ্যে ভারতের উন্নতির যে প্রমাণ আমরা এইভাবে প্রাপ্ত হই, তাহার প্রভাবে ভারতীয় সমাজের অভ্যন্তরেও যে নানাবিধ পরিবর্তন সাধিত হইতেছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। খৃষ্টীয় প্রথম হইতে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে উৎকীর্ণ বহু লিপি নানা স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। নাসিক, জুনার, বসার, ইন্দোর, মান্দাসোর এবং

ভট্টস্বামী মন্দিরস্থিত লিপিমালা পাঠ করিলে আমরা জানিতে পারি যে, তখন বিভিন্ন ব্যবসায়ী বা শিল্পিকুলের মধ্যে পূগ, গণ, শ্রেণী প্রভৃতি নামে নানা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং এক এক বৃত্তি অনুসরণকারী ব্যক্তিগণ স্বীয় প্রতিষ্ঠানের শাসনাধীনে থাকিয়া সমবেত-ভাবে চলিবার চেষ্টা করিত। যেসকল বৃত্তির মধ্যে এইরূপে প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে তাহার মধ্যে কয়েকটির নাম করা যাইতে পারে: শস্য ব্যবসায়ী, তেজারৎকারী, তৈলকার, গণৎকার, পুরোহিত, গায়ক, যোদ্ধা, মালি, মালাকর ইত্যাদি।

বৌদ্ধযুগ হইতেই আরও একটি বিষয় আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি। বহির্বাণিজ্য এবং অন্তর্বাণিজ্যের ফলে ব্যবসায়লিপ্ত ব্যক্তিগণ প্রভূত ধনসম্পদের অধিকারী হইতেন। তাঁহাদের ঘরে বিপুল শস্যের ভাণ্ডার সঞ্চিত থাকিত এবং শিল্পিকুলকে নিয়োজিত করিয়া তাঁহারা যেসকল দ্রব্য উৎপাদন করাইতেন, আবার তাহারই ব্যবসায়ের দ্বারা যথেষ্ট লাভবান হইতেন। নগরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিত্তশালী বলিতে শ্রেষ্ঠীগণকেই বুঝাইত; এবং রাজার উপরে, এমন কি, রাজ্যপরিচালন ব্যাপারে, তাঁহারা যথেষ্ট ক্ষমতা বিস্তার করিতে সমর্থ হইতেন। ক্রমে বাহির হইতে আনীত স্বর্ণ ও স্বদেশে উৎপন্ন পণ্যসম্ভারে ভারতবর্ষ ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল; কেননা ধনসম্পদের প্রাচুর্য সত্ত্বেও অসম বণ্টনের অশুভ ফলস্বরূপ কোথাও কোথাও দুর্ভিক্ষ দেখা দিত, ধনীকুল দানের আদর্শ গ্রহণ করিয়াও আর্থিক অসমতা রোগ হইতে দেশকে নিরাময় করিতে পারেন নাই। চণ্ডালাদি তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর অবস্থা পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশের অনুকূল কখনও ছিল না।

নাগরিক জীবনের আদর্শ

সেই সময়ে সাধারণ নাগরিকের জীবনে ভোগের আদর্শ কি আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা আমাদের বিচার করিবার প্রয়োজন আছে। পুরাতন সাহিত্যের মধ্যে আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মশাস্ত্র বা পুরাণাদির প্রতিই বেশি আকৃষ্ট হই। যে কালের কথা বলা হইতেছে তখন, ভারতীয়

দর্শনের উচ্চ শিক্ষাকে জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া দিবার জন্য নানা পুরাণ গ্রন্থ লেখা হইয়াছে বা হইতেছে। মুখে মুখে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ব্যাপ্তি ঘটিতেছিল বটে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভোগের প্রলোভন এবং আদর্শও যেভাবে সুখী সংসারীর চরিত্রে খানিক শৈথিল্য আনিয়া দেশকে দুর্বল করিয়া দিতেছিল এবং পরবর্তী কালে মুসলমান সভ্যতার আক্রমণকে প্রতিরোধ করিতে অক্ষম করিয়া দিতেছিল, তাহাও অভিনিবেশ সহকারে আমাদের পরীক্ষা করিতে হইবে।

অধ্যাপক হারাণচন্দ্র চাকলাদার, 'সোস্যাল লাইফ ইন এনসিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া' নামে একখানি অতি মূল্যবান গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, বাৎস্যায়ন মুনি খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন এবং সম্ভবত দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশে বসবাস করিতেন। যে সময়ে কামসূত্র সংকলিত হয় সে সময়ে ঐশ্বর্যভারাক্রান্ত ইহলোকসর্বস্ব জীবন-দর্শনের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কামসূত্রের প্রথম অধ্যায়ে এইরূপ মতের উল্লেখ করিয়া বাৎস্যায়ন তাহা খণ্ডনের পর ধর্মের মর্যাদা স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

> ধর্মাচরণ করিবার প্রয়োজন নাই; কারণ তাহার ফল ইহজন্মে পাওয়া যায় না এবং যজ্ঞাদি সাধিত হইলেও ফল হইবে কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহও আছে।
>
> আগামীকল্যকার ময়ূর লাভ অপেক্ষা অদ্যকার পারাবত লাভ মন্দের মধ্যে ভাল।
>
> সংশয়সঙ্কুল হেমশত লাভ অপেক্ষা নিঃসন্দেহে এক কার্ষাপণও মন্দের ভাল।—এই কথা লৌকায়তিকগণ বলিয়া থাকেন।

বাৎস্যায়ন সূক্ষ্ম যুক্তি-তর্কের সহায়তায় এই মতকে খণ্ডন করিলেও তাঁহার গ্রন্থে সাংসারিক জীবন এবং ভোগবিলাসের যে আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় অনেক আছে। নিম্নের উদ্ধৃতি দীর্ঘ হইলেও পাঠকগণকে ইহা ধৈর্য ধরিয়া অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিতে বলি; কারণ ইহা হইতে তিনি প্রায় দেড় হাজার বৎসরের পুরাতন ভারতীয় সমাজের একটি বাস্তব চিত্র সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

বিদ্যাগ্রহণ করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রম প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণ প্রতিগ্রহ, ক্ষত্রিয় বিজয়, বৈশ্য ক্রয় ও শূদ্র নির্বেশ (ভৃতি চাকরী) দ্বারা অধিগত অর্থে বা পিতৃপিতামহাগত উপায় ও পূর্বকথিত উপায়, এই উভয়বিধ উপায় দ্বারা অর্জিত অর্থে নাগরিকবৃত্তের অনুবর্তন করিবে।

নগরে, পত্তনে (রাজধানীতে), খর্বটে (দুইশত ক্ষুদ্র গ্রাম যে স্থানে অবস্থান করে), অথবা মহৎ সজ্জনাশ্রয় যেখানে, সেখানে অবস্থান করিবে। কিংবা যেখানে থাকিলে শরীর যাত্রা নির্ব্বাহ হয়

সে স্থানে গৃহ করিবে। নিকটে জল থাকিবে। যে দিকে জল থাকিবে সে স্থানে বৃক্ষবাটিকা থাকা আবশ্যক। গৃহের কর্মানুসারে এক একটি কক্ষ বিভাগ করিবে। বাসগৃহদ্বয় করিবে বা করাইবে।

বাহিরের বাসগৃহেও অতি সুন্দর দুইটি বালিশ ও তাহার মধ্যে অতি শুভ্র চাদর পাতা শয্যা থাকিবে। আর তাহার নিকটে সেইরূপই কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্রাকার আর একটি শয্যা থাকিবে। তাহার শিরোভাগে তৈলচিত্রযুক্ত কূর্চ্চাসন (ব্রাকেট) স্থাপন কর্ত্তব্য এবং তাহার পাদদেশে একটি বেদিকা কাষ্ঠময়ী (টেবিল) থাকিবে। সেখানে রাত্রের উপভোগযোগ্য অনুলেপন, মাল্য, সিক্থকরণ্ডক (মোম দ্বারা রঞ্জিত পেঁটরা), সৌগন্ধিকপুটিকা, (গন্ধের কৌটা, শিশি ইত্যাদি রাখিবার পেঁটরা), মাতুলুঙ্গী ত্বক (দাড়িম্ব বা টেবা বা নারিঙ্গ লেবুর ছাল), এবং পান থাকিবে। ভূমিপ্রদেশে পতদ্গ্রহ (পিকদানী), হস্তিদন্তাবসক্ত বীণা, চিত্রফলক, বর্তিকাসমুদ্গক (চিত্র কর্মোপযোগী তুলিকা রঙ্গ প্রভৃতি), যে কোনও পুস্তক, কুরণ্টক (পীতঝাঁটী ফুল) মালা, শয্যার নিকটেই ভূমিতে সমস্তক বৃত্তাস্তরণ (চেয়ার), আকর্ষফলক ও দ্যূতফলক (খেলিবার ছক), তাহার বাহিরে ক্রীড়াপক্ষীর পঞ্জরসকল (খেলার পাখির খাঁচাসকল), একটি নির্জ্জন প্রদেশে তক্ষণকার্য্যের স্থান করিবে এবং তথায় অন্যান্য ক্রীড়ার স্থানও করিবে। ভালরূপে আস্তরণ পাতা (চিত্র-বিচিত্র বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত) সুরভিছায়াসম্পন্ন প্রেঙ্খাদোলা (দোল খাইবার দোলা) বৃক্ষবাটিকার মধ্যেই করিতে হইবে। সেই গৃহোদ্যান মধ্যেই কুসুমিত লতামণ্ডপের নিম্নে চত্বর (চৌতারা) যুক্ত স্থণ্ডিলময়ী—পরিষ্কৃত ভূমিতে পীঠিকা (বেদিকা) একটি করিতে হইব। এইরূপে ভবনে আবশ্যকীয় দ্রব্যের বিন্যাস করিবে।

নায়ক প্রাতঃকালে উঠিয়া নিত্যক্রিয়া করিবে। পরে দন্তধাবনপূর্ব্বক কিছু অনুলেপন ধূপ ও মাল্য গ্রহণ করিয়া, (ওষ্ঠে) অলক্তক দিয়া, পান

খাইয়া, সিক্‌থক দিয়া (ঈষদার্দ্র অলক্তকপিণ্ডী ওষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া পান খাইয়া মোমের গুলিদ্বারা ঘসিবে), আদর্শে (আয়নায়) মুখ দেখিয়া, মুখবাস ও তাম্বুলপাত্র গ্রহণ করিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করিবে।

প্রত্যহ স্নান; দ্বিতীয় দিনে উৎসাদন—উদ্বর্তন, অর্থাৎ তৈল-চন্দনাদি দ্বারা পরিষ্করণ, তৃতীয় দিনে ফেনক, অর্থাৎ ফেনকারী স্নেহময়দ্রব্য দ্বারা গাত্র ঘর্ষণ, চতুর্থক আয়ুষ্য ক্ষৌরীকর্ম্ম, পঞ্চমক ও দশমক প্রত্যায়ুষ্য; স্নানাদিপঞ্চক তাহার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিবে। সর্বদার জন্য সংবৃত (গুপ্ত) গৃহে ঘর্ম্মাপনোদন কর্ত্তব্য। পূর্ব্বাহ্ন ও অপরাহ্নে ভোজন করিবে। চারায়ণের মতে পূর্ব্বাহ্নে ও সায়াহ্নে ভোজন কর্ত্তব্য। পূর্ব্বাহ্নে ভোজনান্তর শুক-সারিকাকে পড়ান ব্যাপার, লাবক, কুক্কুট ও মেষের যুদ্ধ, আর সেই সেই কলাক্রীড়া এবং পীঠমর্দ্দ বীট-বিদুষকাদির সহিত সন্ধি-বিগ্রহাদি ও দিবাশয়ন কার্য্য। নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া কেশপ্রসাধন-পূর্ব্বক বৈকাল বেলায় বিহারবেশে গোষ্ঠীতে সভা-সমিতিতে বিহার। সন্ধ্যাকালে সঙ্গীত; সঙ্গীতের পর বাহিরের বাসগৃহ পুষ্পাদি দ্বারা প্রসাধিত হইলে এবং সুরভি ধূপ দ্বারা সুবাসিত হইলে সহায়ের (সহচরের) সহিত শয্যায় অভিসারিকার প্রতীক্ষা করিবে। না আসিলে দূতী পাঠাইবে। মান করিয়া না আসিলে স্বয়ং যাইবে। আসিলে পরে মনোহর আলাপ ও মনোহর উপহার দ্বারা সহায়কারিগণের সহিত মনস্তুষ্টি করিতে উপক্রম করিবে। দুর্দ্দিনে—অর্থাৎ মেঘাচ্ছন্ন দিনে অভিসারকারিণীর বৃষ্টিপাত দ্বারা বেশভূষার বিপর্য্যয় ঘটিলে স্বয়ংই আবার সেইরূপে বেশভূষা করিয়া দিবে। অথবা পরিচারক দ্বারা পরিচরণ করাইবে। এই অহোরাত্র সাধ্য ব্যাপার।

যাত্রার ব্যবস্থাপন, গোষ্ঠীতে সমবায়, সকলে মিলিয়া পান-ব্যবস্থা, উদ্যানে গমন, সমস্যা ক্রীড়াও প্রবর্তিত করিবে। পক্ষে বা মাসে কোন একটি বিজ্ঞাত দিনে সরস্বতী গৃহে নিযুক্তগণের নিত্য সমাজ। আগন্তুক নট-নর্ত্তকনর্ত্তকীগণকে আপনাদিগের নৃত্য-গীত-কলা প্রদর্শন করাইবে। দ্বিতীয় দিনে নটনর্তকগণ তাহাদের নিকট আদর ও পারিতোষিক লাভ করিবে। তাহার পর শ্রদ্ধা থাকিলে ইহাদিগের নৃত্যাদি দর্শন করিবে বা তাহাদিগকে বিদায় দিবে। কোনরূপ ব্যসন, ব্যাধি বা শোকাদি উপস্থিত হইলে বা উৎসবে প্রবৃত্ত হইলে ইহাদিগের এককার্য্যকারিতা থাকা আবশ্যক। যেসকল আগন্তুকের সেস্থলে

মেলন হইবে, তাহাদিগের পূজা ও ব্যসনের সময়ে উপকারাদি দ্বারা সাহায্য করিবে। এই হইল গণধর্ম্ম। ইহা দ্বারা সেই সেই দেবতাবিশেষের উদ্দেশ্যে যে যাত্রা করা হইবে, তাহার ব্যবস্থা করিবার কথাও ব্যাখ্যাত বা কথিত হইল।

গোষ্ঠী সমবায় কি, তাহা বলিতেছেন :

বেশ্যার বাটীতে বা সভায় অথবা অন্যতম নাগরিকের বাটীতে বেশ্যা-দিগের সহিত সমান-বিদ্যা, সমান-বুদ্ধি, সম-স্বভাব, সমধন ও সমবয়স্কগণের অনুরূপ আলাপের সহযোগে যে একাসনে অবস্থান, তাহার নাম গোষ্ঠী। তথায় ইহাদিগের কার্য্য কাব্যচর্চ্চা বা কোন কলার চর্চ্চা। সেই গোষ্ঠীতে লোক-মনোহরা কলার নাগরকের পূজা কর্ত্তব্য এবং প্রীতির অনুরূপ তাহাদিগের পরিচারিকা দ্বারা সেবাশুশ্রূষাও কার্য্য।

পরস্পরের বাটীতে আপনক কার্য্য।

তাহাতে মধু, মৈরেয়, সুরা, আসব এবং বিবিধ লবণ, ফল, হরিৎ, শাক, তিক্ত, কটু, অম্ল ও উপদংশ বেশ্যাদিগকে পান করাইবে ও পরে পান করিবে। ইহা দ্বারা উদ্যান-গমন ব্যাখ্যাত হইল।

উদ্যান-গমন বিষয়ে কিছু বিশেষত্ব আছে, তাহা বলিতেছেন:

পূর্ব্বাহ্নেই সুন্দররূপে অলঙ্কৃত হইয়া ঘোটকপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া বেশ্যাদিগরে সহিত পরিচারকগণকে সঙ্গে লইয়া যাইবে। সেখানে দৈনিক যাত্রার উপভোগ করিয়া কুক্কুট-যুদ্ধ ও দ্যূত (দাবা খেলা প্রভৃতি) ক্রীড়া ও নটনর্ত্তকের প্রয়োগ প্রত্যক্ষ করিয়া যাহার যেমন চেষ্টা, সেইরূপ চেষ্টার পূরণ দ্বারা কাল অতিবাহিত করিয়া অপরাহ্নে সেই উদ্যানের চিহ্ন (পুষ্পগুচ্ছ ও মাল্যাদি) গ্রহণ করিয়া সেইরূপেই চলিয়া আসিবে। ইহা দ্বারা কুম্ভীরাদিরহিত রচিত জলাশয়ে (দীর্ঘিকা, বাপী, পুষ্করিণী আদিতে) গ্রীষ্মকালে জলক্রীড়া-গমন ব্যাখ্যাত হইল।

ইহা দ্বারা যে একচারী, সে নিজের ধনবল অনুসারে গণিকা ও নায়িকার স্থানে সখি ও নাগরকের সহিত এইরূপ ব্যবহার করিতে পারে, ইহা ব্যাখ্যাত হইল।

যাহার কিছুমাত্র বিভব নাই ও পুত্রকলত্রাদিও নাই, শরীর মাত্র সহায়, মল্লিকা, ফেনক ও কষায় মাত্র পরিচ্ছদধারী, পূজ্য দেশ হইতে আগত ও

কলায় কুশল, সে ব্যক্তি নাগরক গোষ্ঠীতে কলার উপদেশ করিয়া বেশ্যাজনোচিত বৃত্তে আপনাকে সিদ্ধ করিবে। ইহাকে পীঠমর্দ্দ বলে।

যে সমস্ত বিভব ভোগ করিয়া (খোয়াইয়া) বসিয়াছে, গুণবান এবং দার-পরিজনসমন্বিত, বেশ্যাজনোচিত বেশে ও গোষ্ঠীতে (নাগরকগণের) বহু মত প্রকাশ করিতে সমর্থ এবং বেশ্যাজন ও নাগরকজনকে অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছুক, তাহাকে বীট বলা যায়।

গ্রামবাসী ব্যক্তি স্বজাতীয় বিচক্ষণ কৌতূহলপরায়ণ ব্যক্তিগণকে প্রোৎসাহিত করিয়া নাগরকজনের বৃত্ত বর্ণনা করিয়া শ্রদ্ধা জন্মাইয়া তাহার অনুকরণ করিবে। গোষ্ঠীর প্রবৃত্তি করিবে। সঙ্গতি থাকিলে জনের অনুরঞ্জন করিবে। প্রত্যেক কর্ম্মে সাহায্য করিয়া অনুগৃহীত করিবে। যথাসম্ভব উপকারও করিবে।—এই নাগরক বৃত্ত কথিত হইল।

কেবল সংস্কৃত বা কেবল দেশভাষার সাহায্য লইয়া গোষ্ঠীতে কথা না বলিলে লোকে বহুমত হইবে। যে গোষ্ঠীর উপর লোকের বিদ্বেষ আছে বা যেটি স্বতন্ত্রভাবে প্রবৃত্ত বা যথায় কেবল পরহিংসা, পরচর্চ্চাই হইয়া থাকে, বুধ-ব্যক্তি তাদৃশ গোষ্ঠীর অবতারণা করিবে না। লোকের চিন্তানুবর্ত্তিনী লোকচিত্তরঞ্জনকারিণী, ক্রীড়ামাত্রই যাহার একটি মুখ্য কার্য্য, তাদৃশ গোষ্ঠীর সহচর হইলে বিদ্বান লোকে সংসার ক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয়।

সমাজের অপর-এক দিক

দেশে সম্পদ বৃদ্ধির অপর একটি কুফলও প্রাচীন ভারতে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে শাসকবর্গের মধ্যে বিবাদ, কলহ ও দ্বন্দ্ব সদাসর্বদাই লাগিয়া থাকিত। তাঁহারা জাতি অথবা বংশগত মর্যাদা রক্ষার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকিতেন; সৎ রাজা হইলে তিনি প্রজার কল্যাণ সাধনে ব্যাপৃত থাকিতেন, কিন্তু সৎ না হইলে প্রজার আর ভরসা করিবার মত কিছু থাকিত না। তাহারা গ্রামে স্বীয় কৌলিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া যথাসাধ্য চলিবার চেষ্টা করিত; সেই বৃত্তি অনুসরণ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে না পারিলে মজুরি অথবা চাষের চেষ্টা করিত। রাজনৈতিক গগনে যুদ্ধবিগ্রহ তাহাদিগকে আঘাত করিলেও সম্পূর্ণ অভিভূত করিতে পারিত না।

ঐশ্বর্য সংগ্রহের অপর একটি ফল ব্রাহ্মণ বর্ণের আচরণের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বে ব্রাহ্মণগণ বিদ্যাভ্যাস এবং বিদ্যাদানের বৃত্তি অনুসরণ করিয়া চলিতেন; দান, প্রতিগ্রহাদি তাঁহারা যথাসম্ভব কম স্বীকার করিতেন। যাহাও লইতেন, তাহার অধিকাংশ ছাত্রগণের ভরণ-পোষণে ব্যয়িত হইত। কিন্তু যখন ভারতবর্ষের ধনীগণ সত্যসত্যই পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধনীদের আসন গ্রহণ করিলেন, রাজকুল যখন ধনীদের সহিত পাল্লা দিয়া যজ্ঞের জাঁকজমক বৃদ্ধির দিকে মন দিলেন, তখন ব্রাহ্মণ বর্ণের মধ্যেও কিছু অবনতি ঘটিয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। পরবর্তীকালে মহম্মদ গজনি যখন সোমনাথ, নগরকোট প্রভৃতি মন্দির লুণ্ঠন করেন, তখন প্রতি ক্ষেত্রে তিনি যে পরিমাণ সোনা এবং মণিমাণিক্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে অভাবনীয় বলিয়া মনে হয়। এই সম্পদভারাক্রান্ত ব্রাহ্মণকুলের মধ্যে কিছু লোক পুরাণাদি অবলম্বন করিয়া লোকশিক্ষার জন্য চেষ্টিত থাকিলেও এক বৃহৎ অংশ স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া অতিরঞ্জিত ভাষায় রাজন্যবর্গের প্রশস্তি রচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন, ইহা আমরা অনেক ক্ষেত্রেই দেখিতে পাই।

অর্থাৎ ঐশ্বর্যভারের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ সমাজের মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় বর্ণের মধ্যে ধর্মচ্যুতি ঘটিতে লাগিল।

নবম অধ্যায়

মধ্যযুগের ইতিহাস

অন্যান্য দেশের তুলনায় মধ্যযুগে ভারতবর্ষ কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্যে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল এবং কতকটা ইহারই কারণে আফগানিস্থান, মধ্য এশিয়া প্রভৃতি অঞ্চল হইতে ক্রমাগত পাঠান, তুর্ক, মোগল প্রভৃতি ইসলাম ধর্মাবলম্বী জাতিরা ভারতবর্ষে লুঠতরাজ করিবার জন্য আসিতে লাগিল। ভারতবর্ষের মধ্যে সমবেতভাবে বহিরাগত আক্রমণকে প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা দেখা যায় না। কখনও কখনও যতটুকু বা হইয়াছিল, তাহা মুসলমান জাতিবৃন্দের রণকৌশলকে পরাস্ত করিবার পক্ষে পর্যাপ্ত হয় নাই। ক্রমশ মুসলমান দলপতিগণ উত্তর-ভারতে নরপতির আসন অধিকার করিলেন এবং কয়েক শতাব্দীর মধ্যে পঞ্জাব হইতে গৌড় পর্যন্ত তাঁহাদের শাসনাধীন হইয়া গেল।

কিন্তু ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভাগ্যবিপর্যয়ের আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। ভারতীয় সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে এবং হিন্দুসমাজদেহের মধ্যে মুসলমান অধিকারের ফলে কি কি পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল, আমরা সেই সম্বন্ধেই কেবল অনুসন্ধান করিব। দুর্ভাগ্যক্রমে এ বিষয়ে সাক্ষ্যপ্রমাণের বড় অভাব। কারণ, যেসকল মুসলমান পণ্ডিত হিন্দুসমাজকে বুঝিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থের সহায়তায় আদর্শ বর্ণব্যবস্থার সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান সঞ্চয় করিলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে আদর্শ এবং বাস্তবের সংঘাতে বর্ণ-ব্যবস্থা কার্যত কি আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা নিরীক্ষণ করেন নাই। সেইরূপভাবে ইসলামী প্রভাবের আঘাতে কোন্ কোন্ অভিমুখে পরিবর্তন সাধিত হইতে লাগিল, তাহাও তাঁহাদের বিচার্য বিষয় ছিল না। সেইজন্য সমাজের ইতিহাস ও পরিবর্তনের প্রকৃতি বুঝিতে হইলে মুসলিম পণ্ডিতগণের লিখিত বিবরণীকে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে পর্যাপ্ত বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

কুনওয়ার মুহম্মদ আশরফ নামে জনৈক পণ্ডিত ১৯৩৫ সালের এশিয়াটিক সোসাইটির জর্নালে ১২০০-১৫৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যকালে উত্তর ভারতের জনসাধারণের অবস্থা এবং জীবনযাত্রার বিষয়ে একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন; কিন্তু তাহার মধ্যে আমাদের প্রয়োজনোপযোগী বস্তু কম পাওয়া যায়। সামান্য যতটুকু ইঙ্গিত আভাস মেলে তাহার দ্বারা ক্ষুধার বৃদ্ধি হয় মাত্র, উপশমের কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না।

সমগ্র মুসলমান অধিকারকালের সম্বন্ধে যাহা বোঝা যায়, তাহা হইতে মনে হয়, গ্রামের অর্থনৈতিক জীবন পূর্বের মতই অবিচ্ছিন্ন ধারায় চলিত। অর্থাৎ চাষী, কলু, কামার, তাঁতি, পাথরের শিল্পী পূর্বেও যেমন কাজ করিত, মুসলমান শাসনের সময়েও তেমনিভাবেই স্ববৃত্তি অনুসরণ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিয়া চলিত। শহরে নবাব-বাদশাহ বা আমির-ওমরাহদের নিবাসকেন্দ্রের আশপাশে, তাঁহাদেরই আশ্রয়ে, পারস্য বা মধ্য এশিয়া হইতে আগত কিছু কিছু নূতন শিল্পের প্রচলন দেখা যায়। চীনামাটির কাজ, মিনার কাজ, বিদরির কাজ, নানাবিধ চর্মশিল্প. ঐ সময়ে ভারতবর্ষে প্রসারলাভ করে; কিন্তু সেগুলি গ্রামদেশে ছড়াইয়া পড়ে নাই বা পড়া সম্ভবও ছিল না। বাহির হইতে যেসকল শিল্পী বা কারিগরকে এই উদ্দেশ্যে আনা হইয়াছিল, তাহারা ভারতীয় ব্যবস্থা অনুসারে এগুলিকে কৌলিক বৃত্তিতে পরিণত করে নাই; সকল জাতির মানুষই সুযোগ পাইলে নূতন শিল্পগুলি শিখিতে পারিত; কোন জাতিগত বাধা সেক্ষেত্রে ছিল বলিয়া মনে হয় না।

কিন্তু প্রাচীন শিল্পগুলি তখনও পূর্বের মত কৌলিক অধিকারের অধীন থাকিয়া গেল। এমন কি, কোন কোন জাতি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা সত্ত্বেও পুরানো সামাজিক নিয়মের পরিবর্তন সাধন করে নাই। অতি অল্পকাল পূর্বেও বাঙলাদেশে হিন্দু জেলের কাজ ছিল মাছ ধরা, মুসলমান নিকারী তাহা বিক্রয় করিত, একে অপরের কাজ করিতে চাহিত না। আজও মুসলমান কলু পূর্ববঙ্গে তেলের ঘানি চালায়, অপরে চালায় না; এবং মুসলমান সমাজেও মর্যাদার দৃষ্টিতে কলুর স্থান অপরের সমান নহে। বিহার বা বাঙলাদেশে মুসলমান জোলার

অবস্থাও কতকটা তাই। অর্থাৎ গ্রামের মধ্যে উৎপাদন-ব্যবস্থা মোটের উপর মুসলমান শাসনের মধ্যেও প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায় টি'কিয়া ছিল।

রাজা-বাদশাহের প্রয়োজনে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা শিল্পে কৌলিক অধিকারের মধ্যেও স্বল্পপরিমাণ পরিবর্তন ঘটিতে দেখি। সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি রাজ-সরকারের কাজে সত্তর হাজার পাথরের শিল্পী নিয়োগ করিয়াছিলেন। ই'হারা পুরাতন আমলের হিন্দু শিল্পী ছিলেন বলিয়াই মনে হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে আলতমাশ আজমীরে তারাগড় পর্বতের পাদদেশে মসজিদ নির্মাণ করাইবার জন্য হিন্দু শিল্পী নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু পরবর্তীকালে ফিরোজ তোগলক স্বীয় ক্রীতদাসগণের মধ্যে চার হাজার ব্যক্তিকে পাথরের কাজে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ আছে। অর্থাৎ প্রস্তরশিল্পে কৌলিক অধিকার ক্ষেত্রবিশেষে লঙ্ঘিত হইয়াছিল। মহমুদ গজনী, তৈমুরলঙ্গ, ভারতবর্ষ হইতে পাথরের শিল্পীদের জোর করিয়া আফগানিস্থান ও মধ্য এশিয়ায় লইয়া গিয়াছিলেন, ইহারও ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। এইরূপ কোন কোন ঘটনায় পুরাতন ব্যবস্থার উপর আঘাতের চিহ্ন থাকিলেও উহা যে মোটের উপরে অভগ্ন অবস্থায় রহিয়া গিয়াছিল, ইহা আমরা ধরিয়া লইতে পারি। শিল্পীকুল ইসলাম স্বীকার করিলেও তাহাদের পূর্বতন জাতীয় অভিমান এবং মর্যাদাবোধ কিভাবে বজায় রাখিত, তাহার একটি প্রমাণ আধুনিক কাল হইতে দিবার চেষ্টা করিব।

মানুষে নানা কারণে মুসলমান হইয়া থাকে। যাঁহারা বুঝিয়া সুঝিয়া ইসলামের একেশ্বরবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন, অথবা মুসলিম সমাজের সঙ্ঘশক্তির আকর্ষণে ধর্মান্তর গ্রহণ করেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু অপর কারণেও যে মানুষে ধর্মান্তরিত হইয়াছে, তাহার কথা বলিতেছি। উড়িষ্যায় বালেশ্বর এবং ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের সংযোগস্থলে গড়পদা নামে একটি গ্রাম আছে। এইখানে প্রাচীনকালে এক ব্রাহ্মণবংশের বাস ছিল। সূর্যবংশের রাজা পুরুষোত্তমদেব (১৪৭০-৯৭ খৃষ্টাব্দ) এই ব্রাহ্মণ পরিবারকে কিছু ভূমি দান করিয়াছিলেন। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের

সময়ে উড়িষ্যাবিজয় হইলে সেই ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেন, তখন সম্পত্তি তাঁহাদিগকে প্রত্যর্পণ করা হইল এবং তাঁহারা উহা আজও ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন। মহারাজা পুরুষোত্তমদেবের তাম্রশাসনখানি এখনও তাঁহাদের ঘরে সযত্নে রক্ষিত হইতেছে।

এই ব্রাহ্মণ পরিবারের বেলায় যেমন, অনেক শিল্পীবংশকেও তেমনই বাধ্য হইয়া ধর্মান্তর গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। যে সকল পাথরের কারিগর মন্দিরের পরিবর্তে মুসলমান বাদশাহের অধীনে মসজিদ গড়ায় নিয়োজিত হইত, তাহাদের মধ্যে কিছু লোকের পক্ষে জাতিচ্যুত হওয়া স্বাভাবিক এবং পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করাও স্বাভাবিক। ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে আমি একবার কাশী গিয়াছিলাম। সেই সময়ে খোঁজ করিতে করিতে কাশীর করনঘণ্টা নামক পাড়ায় বাবু মিঞা নামক জনৈক মুসলমান ঠিকাদারের সন্ধান পাই। ইনি পুরাতন শিল্পীবংশের লোক। দুঃখ করিয়া বলিলেন, আজকাল লোকে আর তাঁহাদের ডাকে না, আদর করে না। অথচ মন্দিরে মন্দিরে প্রভেদ কোথায়, বিভিন্ন দেবতার মন্দিরে কি প্রভেদ থাকা উচিত, তাহা অপর কেহ জানে না। আগে এ কাজ শিল্পীবংশেরই ছিল, আজকাল মন্দির গড়িতে হইলে লোকে ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুলে-পড়া ঠিকাদারকে ডাকে; সেইজন্য তিনি বাধ্য হইয়া ছেলেকে ইস্কুলে দিয়াছেন। তাঁহাদের বাড়িতে পুরানো হাতে-লেখা খাতায় মন্দিরের লক্ষণাদি লিখিত আছে, অথচ ভবিষ্যতে আর কেহ তাহার আদর করিবে বলিয়া মনে হয় না।

বাবু মিঞা স্বীয় বৃত্তির সম্পর্কে যথেষ্ট অভিমান পোষণ করেন এবং শিল্পশাস্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করেন বলিয়া আমার বড় ভালো লাগিয়াছিল। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, 'দেখুন, আজ আর কেহ হিন্দু নাই। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় আপনারা গড়িয়াছেন, তাহার মধ্যে হিন্দুত্ব কতটুকু আছে? বাড়ির গড়নটাই আসল, সাজ-পোষাক আসল নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের গড়ন হইল সম্পূর্ণ খৃষ্টানী, তাহার উপর দুটা মন্দিরের চূড়া বা থাম অথবা লতাপাতা দিয়া ঢাকিলেই কি তাহার গড়নটা ঢাকা যায়, না তাহার জাত পরিবর্তন হয়?' কথাটি শুনিয়া আমার মনে

হইয়াছিল, কোনো জাত-শিল্পীর সহিত কথা বলিতেছি, যাঁহার মধ্যে কৌলিক বিদ্যার সৌরভ এখন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ অবস্থায় বর্তমান রহিয়াছে।

হিন্দু শিক্ষিত সমাজে পরিবর্তন

পুরাতন বর্ণব্যবস্থার আর্থিক মেরুদণ্ড এইরূপে অপেক্ষাকৃত অভগ্ন অবস্থায় থাকিলেও সমাজের মধ্যে ধর্মবিশ্বাসে অথবা ব্যবহারে নানাবিধ পরিবর্তনের প্রমাণ পাওয়া যায়। কোনে কোনো শিল্পিকুলের মত শহরের বাসিন্দা অথবা রাজসরকারের চাকুরিয়াদের মধ্যেও পরিবর্তনের পরিমাণ অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। এবং ইহারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আমরা মধ্যযুগের ভারতবর্ষে অনেকগুলি ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের প্রচেষ্টা দেখিতে পাই। নানক, কবীর, দাদু প্রভৃতি বিভিন্ন সাধুগণের প্রবর্তিত সম্প্রদায় ভিন্ন আরও অনেক সম্প্রদায় হিন্দুর সমাজ-ব্যবস্থাকে ভাঙিয়া আরও উদার ও গণতান্ত্রিক করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আবার অপরপক্ষে রঘুনন্দনের মত সংস্কারক আসিয়া হিন্দুধর্মকে গণতন্ত্রের পথে পরিচালিত না করিয়া তাহার মধ্যে সময়-জনিত আবর্জনা দূর করিয়া শুদ্ধতররূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; ইহাও একই কালে আমরা ঘটিতে দেখি।*

মুসলমান রাজত্বকালে সমাজের মধ্যে চৈতন্যদেব যে বিপুল আন্দোলন আনিয়াছিলেন, তাহাও কিন্তু উত্তরকালে গোঁড়ামির আঘাতে এক দিক দিয়া পরাস্ত হইয়া গেল। গ্রামের অর্থনৈতিক সংগঠন তখনও প্রাচীন আকারেই রহিয়া গিয়াছিল, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। সেখানে বৃত্তিতে কৌলিক অধিকার এবং বিভিন্ন শিল্পী অথবা সেবককুলের মধ্যে মর্যাদার তারতম্য, পূর্বের মত অক্ষত অবস্থায় রহিয়া গিয়াছিল। গ্রাম-

* যাঁহারা এইসকল ধর্মসম্প্রদায়ের বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জানিতে চান, তাঁহারা স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়' অথবা অধ্যক্ষ ক্ষিতিমোহন সেনের 'জাতিভেদ' পড়িলে লাভবান হইবেন। শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী প্রণীত 'স্বামী বিবেকানন্দ এবং উনবিংশ শতাব্দী'র মধ্যেও পাঠক রঘুনন্দনের আমলের সমাজব্যবস্থার একটি মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ পাঠ করিতে পারেন।

দেশে মুসলমান ধর্মাবলম্বীরাও তাহা বাঁচাইয়া চলিত। আমার মনে হয়, ইহারই ফলস্বরূপ আচার এবং ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রেও রঘুনন্দনেরই জয় সম্ভব হইয়াছিল। মহাপ্রভুর প্রবর্তিত ভাব সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রহিল; সমগ্র সমাজের অনুদারতা ভাঙিয়া তাহা নূতন জীবনের প্লাবন আনিতে সমর্থ হয় নাই। বৈষ্ণবগণ কার্যত এক নূতন জাতিতে পরিণত হইলেন।

মহাপ্রভুর আবির্ভাব ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয়। তাঁহার কিছুকাল পূর্বে মাধ্ব সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীপ্রবর মাধবেন্দ্রপুরী নূতন ভক্তিধর্মের স্রোত বহাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরী। শান্তিপুর নিবাসী অদ্বৈত মহাপ্রভু এই ভক্তিস্রোতে স্নান করিয়া সমগ্র দেশে তাহা প্রবাহিত করিবার সংকল্প করিতেছিলেন। তাঁহার একার ক্ষমতা হইবে না মনে করিয়া তিনি কোনও অবতার পুরুষের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। চৈতন্য মহাপ্রভু যুগধর্মের প্রবর্তকরূপে প্রকাশিত হইলে অদ্বৈত এবং নিত্যানন্দ মহাপ্রভু, রূপ ও সনাতন গোস্বামী সকলে মিলিয়া হিন্দুর জীবনকে সংঘবদ্ধভাবে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে চেষ্টার ফল কতদূর গিয়াছিল, তাহা আভাসে বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। এখন সেই সময়ের সমাজের চিত্র অঙ্কন করিয়া বর্তমান অধ্যায় সমাপ্ত করিব।

মুসলমান রাজত্বকালে হিন্দুসংস্কৃতির একটি চিত্র

নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥
ত্রিবিধ বৈসে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী প্রসাদে সবেই মহাদক্ষ॥
সবে মহা অধ্যাপক করি গর্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে॥
নানা দেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়॥

অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
লক্ষ কোটী অধ্যাপক নাহিক নিশ্চয়॥
রমা দৃষ্টিপাতে সর্ব্ব লোক সুখে বসে।
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার-রসে॥
কৃষ্ণরাম-ভক্তি-শূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার॥
ধর্ম্মকর্ম্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহুধন॥
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়।
এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায়॥
যেবা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্তী মিশ্র সব।
তাহারাই না জানে সব গ্রন্থ অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিতে যম-পাশে ডুবি মরে॥
না বাখানে যুগধর্ম্ম কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দোষ বিনা গুণ কার না করে কথন॥
যেবা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী।
তা সবার মুখেতেও নাহি হরিধ্বনি॥
অতি বড় সুকৃতি সে স্নানের সময়।
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারয়॥
গীতা ভাগবত যে যে জনেতে পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়॥
এই মত বিষ্ণুমায়া মোহিত সংসার।
দেখি ভক্ত সব দুঃখ ভাবেন অপার॥
কেমনে এ জীব সব পাইবে উদ্ধার।
বিষয় সুখেতে সব মজিল সংসার॥
বলিলেও কেহ নাহি লয় কৃষ্ণ-নাম।
নিরবধি বিদ্যা কুল করেন ব্যাখ্যান॥

* * * *

এই মত অদ্বৈত বৈসেন নদীয়ায়।
ভক্তিযোগ শূন্য লোক দেখি দুঃখ পায়॥
সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে।
কৃষ্ণপূজা বিষ্ণুভক্তি কারো নাহি বাসে॥
বাসুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে॥
নিরবধি নৃত্য গীত বাদ্য কোলাহল।
না শুনি কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল॥
কৃষ্ণ-শূন্য মঙ্গলে দেবের নাহি সুখ।
বিশেষে অদ্বৈত মনে পায় বড় দুঃখ॥
স্বভাবে অদ্বৈত বড় কারুণ্য-হৃদয়।
জীবের উদ্ধার চিন্তে হইয়া সদয়॥
মোর প্রভু আসি যদি করে অবতার।
তবে হয় এ সকল জীবের উদ্ধার॥
তবে শ্রীঅদ্বৈত সিংহ আমার বড়াঞি।
বৈকুণ্ঠ-বল্লভ যদি দেখাঙ হেথাঞ॥
আনিয়া বৈকুণ্ঠনাথ সাক্ষাৎ করিয়া।
নাচিব গাইব সর্বজীব উদ্ধারিয়া॥

শ্রীচৈতন্যভাগবত। আদি, ২য় অধ্যায়।

আবির্ভাবের পর মহাপ্রভু যখন গয়ায় শ্রীঈশ্বরপুরীর সহিত মিলিত হইয়া নদীয়ায় ফিরিয়া আসিলেন, সেই সময় হইতেই মানুষকে নাম-সংকীর্তন এবং ভক্তিধর্মের উপদেশ দিতে লাগিলেন।

প্রভু বলে কৃষ্ণভক্তি হউক সবার।
কৃষ্ণ-নাম গুণ বহি না বলিহ আর॥
আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে।
কৃষ্ণ-নাম মহা-মন্ত্র শুনহ হরিষে॥
ইহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥
দশ পাঁচ মিলি নিজ দ্বারেতে বসিয়া।
কীর্ত্তন করহ সবে হাতে তালি দিয়া॥

প্রভু মুখে মন্ত্র পাই সবার উল্লাস।
দণ্ডবৎ করি সবে চলে নিজ বাস॥
নিরবধি সবেই জপেন কৃষ্ণ-নাম।
প্রভুর চরণ কায়-মনে করি ধ্যান॥
সন্ধ্যা হইলে আপনার দ্বারে সবে মেলি।
কীর্ত্তন করেন সবে দিয়া করতালি॥
এই মত নগরে নগরে সংকীর্ত্তন।
করাইতে লাগিলেন শচীর নন্দন॥
একদিন দৈবে কাজি সেই পথে যায়।
মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ শুনিবারে পায়॥
হরি-নাম কোলাহল চতুর্দ্দিকে মাত্র।
শুনিয়া সঙরে কাজি আপনার শাস্ত্র॥
কাজি বলে ধর ধর আজি করোঁ কার্য্য।
আজি বা কি করে তোর নিমাই আচার্য্য॥
আথে ব্যথে পলাইল নগরিয়া-গণ।
মহা ত্রাসে কেশ কেহ না করে বন্ধন॥
যাহারে পাইল কাজি মারিল তাহারে।
ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ অনাচার কৈল দ্বারে॥
কাজি বলে হিন্দুয়ানি হইল নদীয়া।
করিব ইহার শাস্তি লাগালি পাইয়া॥
ক্ষমা করি যাও আজি দৈবে হৈল রাতি।
আর দিন লাগালি পাইলে লইব জাতি॥
এই মত প্রতিদিন দুষ্টগণ লৈয়া।
নগরে ভ্রময়ে কাজি কীর্ত্তন চাহিয়া॥
দুঃখে সব নগরিয়া থাকে লুকাইয়া।
হিন্দুগণে কাজি সব মারে কদর্থিয়া॥

শ্রীচৈতন্যভাগবত। মধ্য, ২৩শ অধ্যায়।

ইতিমধ্যে কিছু হিন্দু—হয়তো ধনবান লোকই হইবেন—কাজিকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য, জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ্যভাবে ধর্মাচরণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া আসেন। মহাপ্রভু অবস্থা বিবেচনা করিয়া কাজির

আইন অমান্য করিয়া রাত্রে বিরাট এক কীর্তনের দল লইয়া কাজির সহিত মোকাবেলা করিতে যান। হয়তো সে মিছিলে সাধারণ লোকই ছিল, সম্পদশালীরা আইন অমান্যের দায়িত্ব স্বীকার করিতে চাহেন নাই; কারণ কাজি মহাপ্রভুর নিকট পরে বলিয়াছিলেন:

হেনকালে পাষণ্ডী হিন্দু পাঁচ সাত আইল॥ ২০৪
আসি কহে হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাই।
যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল কভু শুনি নাই॥ ২০৫
মঙ্গলচণ্ডী বিষহরি করি জাগরণ।
তাতে নৃত্য-গীত বাদ্য যোগ্য আচরণ॥ ২০৬
পূর্ব্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত।
গয়া হৈতে আসিয়া চালায় বিপরীত॥ ২০৭
উচ্চ করি গায় গীত দেয় করতালী।
মৃদঙ্গ-করতাল শব্দে কর্ণে লাগে তালি॥ ২০৮
না জানি কি খাইয়া মত্ত হৈয়া নাচে গায়।
হাসে কান্দে পড়ে উঠে গড়াগড়ি যায়॥ ২০৯
নগরিয়াকে পাগল কৈল সদা সঙ্কীর্ত্তন।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই—করি জাগরণ॥ ২১০
'নিমাই' নাম ছাড়ি এবার বোলায় 'গৌরহরি'।
হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ডী সঞ্চারি॥ ২১১
কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ রাড়বাড়।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড়॥ ২১২
হিন্দু শাস্ত্রে ঈশ্বর নাম মহামন্ত্র জানি।
সর্ব্বলোকে শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য হয় হানি॥ ২১৩
গ্রামের ঠাকুর তুমি, সবে তোমার জন।
নিমাই বোলাইয়া তারে করহ বর্জ্জন॥ ২১৪

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। আদি, ১৭শ অধ্যায়।

দশম অধ্যায়

ইংরেজী আমলে পরিবর্তনের ধারা

হিন্দুসমাজের মধ্যে কৌলিক বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া যে উৎপাদন এবং বণ্টনব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার মধ্যে শোষণ এবং শ্রেণীগত অসমতা থাকা সত্ত্বেও পারস্পরিক সহযোগিতার বন্ধন, নূতন স্থানে গ্রাম-পত্তনের সম্ভাবনা, বিদেশে শিল্পজাত মাল বিক্রয় এবং প্রতি কুল অথবা জাতির দেশাচার বা কুলাচার পালনে স্বাধীনতা থাকার কারণে তাহা দীর্ঘদিন ধরিয়া টিঁকিয়া রহিল। মুসলমান আমলে আমাদের অনুমান হয়, শহরের আশপাশে প্রাচীন ব্যবস্থার কিছু অদলবদল হইলেও গ্রামে উহা কায়েমী অবস্থায় টিঁকিয়া গিয়াছিল; এবং খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত শিল্পসামগ্রী উৎপাদন ও বিদেশে বিক্রয়ের দ্বারা ভারতবর্ষ অন্যান্য দেশ হইতে প্রভূত ধনসম্ভার আকর্ষণ করিয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েক শত বৎসর এই সম্পদের লোভে যেমন পাঠান, তুর্ক বা মোগল জাতি ভারতবর্ষকে আক্রমণ করে; খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী হইতেও তেমনই পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী এবং ইংরেজ বণিককুল ভারতে আকৃষ্ট হইয়া নূতন এবং আরও সূক্ষ্ম উপায়ে ধনসংগ্রহের চেষ্টা করিতে থাকে। শেষ দুই শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপের ধনোৎপাদন ব্যবস্থায়ও যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হয় এবং ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ভাগ্য-বিপর্যয়ের মধ্যেও তাহার প্রতিক্রিয়া স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিতে থাকে। সম্প্রতি শ্রীযুত নির্মলচন্দ্র সিংহ 'স্টাডীজ ইন্ ইণ্ডো-ব্রিটিশ ইকনমি হাণ্ড্রেড ইয়ার্স এগো' নামে একখানি মূল্যবান গ্রন্থে অতি সংক্ষেপে ইহার এক মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। কৌতূহলী পাঠককে বইখানি পড়িয়া দেখিতে বলি। কিন্তু আমাদের দৃষ্টি হিন্দুসমাজ গঠনের দিকে বিশেষভাবে নিবন্ধ থাকায় আমরা অপর এক দিক হইতে বৃটিশ অধিকারকালের ইতিহাস পর্যালোচনা করিব।

রায়পুর

বর্ধমান জেলার উত্তরে এবং বীরভূম জেলার দক্ষিণ সীমানা দিয়া অজয় নদ প্রবাহিত হইয়াছে। ইহা বিহারের পার্বত্য অঞ্চলে উদ্ভূত হইয়া পূর্বমুখে বহিয়া ভাগীরথীর সহিত কাটোয়া গ্রামের নিকট সম্মিলিত হইয়াছে। অজয়ের উভয় কূল অতি উর্বর। এক সময়ে অজয় নদের পথেই এ অঞ্চলের ব্যবসাবাণিজ্য চলাচল করিত। ইহার পাশে প্রাচীনকাল হইতে সমৃদ্ধিশালী গ্রামের পত্তন হইয়াছিল। ইছাই ঘোষের দেউল আনুমানিক নবম শতাব্দীতে রচিত হয়। সুপুর গ্রামে, দেউলিতে ও অপরাপর স্থানেও বহু উৎকৃষ্ট পাথরের দেবদেবীর মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার কিছু পাল, কিছু সেনবংশের রাজত্বের সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে। বোলপুর শহরের অনতিদূরে সুপুর গ্রাম অবস্থিত। এক সময়ে এখানে ব্যবসায়ের একটি কেন্দ্র ছিল। নদীপথে লবণ আমদানি হওয়ার কারণে আজও সুপুর গ্রামের এক অংশ নুনডাঙগা নামে প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। সুপুরের পশ্চিমে মির্জাপুর এবং তাহার পাশেই রায়পুর গ্রাম। রায়পুর গ্রামে সুপুরের মত প্রাচীন ভগ্নাবশেষ নাই; কিন্তু রায়পুরের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা ইংরেজ অধিকারের বিস্তৃতি ও হিন্দুসমাজের উপরে তাহার প্রভাবের একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে বাণিজ্য ব্যপদেশেই আগমন করেন। ফরাসীরাও তাহাই করিয়াছিলেন, কিন্তু ফরাসীগণ মনে করেন যে, মোগল রাজ্যশাসন দুর্বল হওয়ার ফলে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে মারাঠাশক্তি ও অপরাপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজশক্তির অভ্যুত্থানের ফলে যে অরাজকতা দেখা দিয়াছে, তাহার মধ্যে সত্যসত্যই লাভবান হইতে হইলে চুপ করিয়া বসিয়া থাকা চলিবে না। এক পক্ষ বা অপর পক্ষকে সমর্থন করিয়া নিজেদের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সেই চেষ্টায় ফরাসীগণ যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছিলেন। পরে তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ইংরেজও সে খেলায় যোগ দেন। দুই শক্তির দ্বন্দ্বের মধ্যে শেষ পর্যন্ত ইংরেজের জয় হয় এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ব্যবসাবাণিজ্য

অপেক্ষা ক্রমশ অন্যদিকে বেশি জড়াইয়া পড়েন। বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের ঠিকাদারী গ্রহণ করার পর কোম্পানির মন ক্রমে অন্যদিকে ঢলিতে লাগিল। সে সময়ে দেশে অরাজকতা এবং রাজশক্তির অদূরদর্শিতার ফলে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, বহুলোক প্রাণত্যাগ করে এবং দেশের অর্থনৈতিক জীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হইয়া যায়। লোকে তখন একটু স্বস্তিতে নিশ্বাস ফেলিয়া খাইয়া-পরিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চায়; অনিশ্চিত রাজনৈতিক আবেষ্টনের মধ্যে পুরাতন বর্ণব্যবস্থা মানুষের খাওয়া-পরার আর সুব্যবস্থা করিতে পারিতেছিল না। এক দিক হইতে বলা চলে যে, উৎপাদন ব্যাপারে বর্ণব্যবস্থা যতই ভাল হউক না কেন, বর্ণব্যবস্থার আত্মরক্ষা করিবার কোনও ক্ষমতা ছিল না। মুসলমান অধিকারকালে ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক বিপ্লবসাধন ঘটে নাই। এদেশে প্রবেশ করিয়া বাহুবলের দ্বারা মুসলমানগণ চলতি ধনতন্ত্রের মধ্যে মুখ্য আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং রাজস্ব আদায় করিয়া শাসককুল নিজেদের পরগাছা সমাজের পুষ্টিসাধন করিতেন। মূল গাছ মরে নাই, মারার অভিলাষ অথবা কারণও মুসলমান শাসকদের ছিল না। কিন্তু ইংরেজ অধিকারের পরে-পরেই ইউরোপের উৎপাদনব্যবস্থায় যুগান্তর সাধিত হইল, ইউরোপীয় শক্তি স্বীয় রাষ্ট্রবল বা বাহুবল প্রয়োগ করিয়া ভারতের ধনতন্ত্রকে নিজেদের জোয়ালে যুতিলেন এবং এই সময়ে বর্ণ-ব্যবস্থার দুর্বলতা, অর্থাৎ আত্মরক্ষা করার ক্ষমতার অভাব, অতি ভয়ঙ্কর-ভাবে প্রকট হইয়া উঠিল।

এই পটভূমিকা পশ্চাতে রাখিয়া এবার রায়পুরের ইতিহাস পর্যালোচনা করা যাক। পূর্বেই বলিয়াছি, সুপুরের তুলনায় রায়পুর অতি নূতন গ্রাম। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে বোলপুরের সন্নিকটে জন চীপ নামে জনৈক কুঠিয়াল বাস করিতেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে কেহ কেহ তখন স্বাধীনভাবে ব্যবসাবাণিজ্য আরম্ভ করিয়াছেন। মেদিনীপুর জেলার উত্তরভাগে চন্দ্রকোণা নামক স্থানে এক প্রাচীন উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থবংশের বাস ছিল। সেই বংশের শ্রীলালচাঁদ সিংহ অজয় নদের নিকটে রায়পুরে বসবাস আরম্ভ করেন। মুসলমানী আমলে বা তাহার পূর্বকালেও ভারতবর্ষ হইতে বহু তাঁতের কাপড়

বিদেশে রপ্তানি হইত বলিয়া নানাস্থানে তাঁতীদের ঘন বসতি ছিল। লালচাঁদ চন্দ্রকোণা হইতে এক হাজার তাঁতী আনিয়া মির্জাপুর, রায়পুর প্রভৃতি গ্রামে বসাইয়াছিলেন। লালচাঁদের পুত্র শ্যামকিশোর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী জন চীপের নিকট মুৎসুদ্দির কাজ করিতেন। তিনি সেই সহস্র তাঁতী দ্বারা প্রচুর মোটা থান উৎপাদন করাইয়া এজেন্সিতে সরবরাহ করিতেন। প্রত্যহ শ্যামকিশোরকে নাকি প্রত্যেক তাঁতী এক টাকা করিয়া নজরানা দিত। তাঁতের কারবারের প্রসাদে সিংহ-বংশের প্রচুর অর্থাগম হইতে লাগিল।

সে সময়ে বীরভূমের অধিকার রাজনগরস্থিত 'রাজা' উপাধিধারী মুসলমান ফৌজদারগণের আয়ত্তে ছিল। রাষ্ট্রনৈতিক ভাগ্যবিপর্যয়ের বশে তাঁহাদের অর্থকষ্ট ঘটে। চীপ সাহেবের বাহুবলের প্রসাদে দেশে সাধারণ অরাজকতা থাকা সত্ত্বেও সিংহ পরিবারের কারবার শান্তিতে চলিতেছিল। তাঁহাদের হাতে সঞ্চিত অর্থের অভাব ছিল না। সেই অর্থের বিনিময়ে রাজনগরের রাজপরিবার সিউড়ি হইতে রায়পুর পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলের জমিদারী সিংহবংশের নিকট বিক্রয় করেন। যাঁহারা তাঁত-শিল্পীদের খাটাইয়া রোজগার করিতেছিলেন, তাঁহারা ভূম্যধিকারীতে রূপান্তরিত হইলেন।

লালচাঁদের পুত্র শ্যামকিশোর; শ্যামকিশোরের পুত্র জগমোহন, ব্রজমোহন, ভুবনমোহন ও মনোমোহন। চারি পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ জমিদারী দেখিতেন, ভুবনমোহন সেরেস্তার কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করিতেন এবং মনোমোহন সঙ্গীতাদি বিদ্যার চর্চা লইয়া কালক্ষেপ করিতেন বলিয়া প্রকাশ। মনোমোহনের চার পুত্র; তাহার মধ্যে সিতিকণ্ঠ শ্রীসত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ বা লর্ড সিংহের পিতা। সিতিকণ্ঠ, শ্যামকিশোর প্রভৃতি সে আমলে উত্তমরূপে ফারসি ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। সিতিকণ্ঠ ফারসি ভিন্ন ইংরেজী শিক্ষাও লাভ করিয়াছিলেন।

সিংহবংশের জমিদারী চলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে ইংরেজ বণিকগণ এই অঞ্চলে লাক্ষা, চিনি, নীল প্রভৃতির এক একটি কারখানা আরম্ভ করিয়া দেন। বিলাতে শিল্পোৎপাদনের যে সকল উন্নত পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইতেছিল, ইংরেজ বণিকগণ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আওতা ছাড়িয়া

নিজেরাই একে একে ভারতে সেই সকল উন্নত শিল্পোৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। চীপ সাহেবের সহায়তায় ডেভিড আর্সকিন নামক এক ব্যক্তি রায়পুরের কয়েক ক্রোশ পশ্চিমে নীলের চাষ আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৮২৮ সালে চীপের মৃত্যু ঘটে এবং তৎপরে ১৮৩৭-এ ডেভিড আর্সকিনের মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার পুত্র হেনরি আর্সকিন নূতন কোম্পানি করিয়া নীলের চাষ চালাইতে থাকেন। প্রবাদ যে সেই সময়ে সিংহবংশের সিতিকণ্ঠ সিংহও ঐ কারবারে তাহাদের সহিত যোগ দেন। ইংরেজ বণিকগণ একজন প্রতিপত্তিশালী জমিদারকে সপক্ষে লাভ করিয়া ব্যবসায়ের পথ সুগম করিয়া লইলেন। সিতিকণ্ঠের জমিদারী চলিতে লাগিল, পুত্রগণ কলিকাতায় ফারসি পড়া ছাড়িয়া ইংরেজী পরীক্ষায় মনোনিবেশ করিলেন। সিতিকণ্ঠ আর্সকিন পরিবারের সহায়তায় পুত্র নরেন্দ্র এবং সত্যেন্দ্রপ্রসন্নের জন্য বিলাতে শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। তাঁহার দ্বারা পরিচালিত নীলকুঠীর ভগ্নাবশেষ আজও নিকটবর্তী গ্রামে ইতস্তত দেখিতে পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে সিতিকণ্ঠের পুত্র সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন বিখ্যাত আইনব্যবসায়ী হইয়াছিলেন এবং উত্তরকালে বিহারের প্রথম ভারতীয় প্রদেশপালরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

রায়পুরের সিংহ পরিবারের জমিদারী আজও বর্তমান রহিয়াছে। কিন্তু বহু শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হওয়ার ফলে এবং জমিদারী হইতে অনুরূপ আয় বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা না থাকায়, ক্রমে পরিবারের অনেকে ডাক্তারি, আইনব্যবসায়, নানাবিধ সরকারি চাকুরির দিকে আকৃষ্ট হইয়া গিয়াছেন। নীল বা তাঁতের কারবারেও আর লাভের আশা ছিল না।

বর্ণব্যবস্থা অনুসারে সিংহপরিবারের যাহা করণীয় ছিল, সে বৃত্তি অনুসরণ করিয়া থাকিলে তাঁহাদের নামই আমরা আজ হয়তো শুনিতে পাইতাম না। কিন্তু ইংরেজী ধনতন্ত্রের আঘাতে যখন স্রোত অন্যদিকে বহিতে লাগিল তখন সেই স্রোতে গা ঢালিয়া সিংহপরিবার কখনও ব্যবসায়ী, কখনও ভূম্যধিকারী, কখনও কারখানার মালিক, কখনও বা রাজ-সরকারের প্রসাদে নানাবিধ বৃত্তি গ্রহণ করিয়া স্বীয় জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া চলিলেন। বর্ণব্যবস্থা সেই পরিবর্তনের স্রোতে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল।

বোলপুরের উদ্ভব ও বিভিন্ন পল্লী

রায়পুর হইতে বোলপুর বেশি দূরে নয়, ব্যবধান প্রায় তিন চার মাইল হইবে। অজয় নদের পথে নৌকার সাহায্যে যে বাণিজ্য চলিত, তাহা বর্ধমান হইতে ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে বিস্তারের সহিত কক্ষচ্যুত হইয়া রেলপথে চলিতে আরম্ভ করিল। বোলপুর রেল স্টেশনে ব্যবসায়ের সুবিধাকে কেন্দ্র করিয়া যে ছোট শহর গড়িয়া উঠিল, তাহা আজ একটি সমৃদ্ধ শহরে পরিণত হইয়াছে। বীরভূম ধানের দেশ। ১৯১৪-১৮র মহাযুদ্ধের পরে ধানের দর খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ধানের কল স্থাপন করিয়া ধনীরা তখন খুব লাভবান হইয়াছিলেন। দ্রুত লাভের আকর্ষণে যাহারই সঞ্চিত অর্থ ছিল সে ধানের কলে বা ধানের কারবারে তাহা খাটাইবার চেষ্টা করিল। ফলে বোলপুরে আজ কুড়িটির উপর ধানকল স্থাপিত হইয়াছে এবং তাহার প্রয়োজনে আশপাশে গ্রামে বহু গোরুর গাড়ি এবং গাড়ির চালক দেখা দিয়াছে। যেসকল গ্রাম্য নারীরা পূর্বে ধানভানাই করিয়া অন্নসংস্থান করিত, তাহারা দুর্দশায় পড়িয়াছে। শহর-বাজার নিকটে থাকার কারণে অজয় নদের আশপাশে তরিতরকারির চাষ বাড়িয়াছে। এইরূপ নানাবিধ আনুষঙ্গিক পরিবর্তন চারিদিকে পরিলক্ষিত হইতেছে।

ইহার প্রভাবে সমাজব্যবস্থায় কি কি পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে, তাহাই আমাদের চিন্তনীয় বিষয়। বোলপুরে প্রত্যক্ষভাবে যাহা দেখিতে পাই, নিম্নে তাহার সংক্ষেপে বর্ণনা দিতেছি। বহু নারীর বৃত্তিলোপের ফলে সমাজদেহে যে অনাচার প্রবেশ করিয়াছে, তাহাই শুধু লক্ষণীয় বিষয় নহে। ধানকল হওয়ার ফলে বা ধানের দর বৃদ্ধি পাওয়ায়, ধানের চাষ চারিদিকে কিছু বাড়িয়াছে সত্য; কিন্তু আজ চাষের ব্যবসায়ও গৃহস্থের খাদ্যের প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রিত না হইয়া অর্থের প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। মুচি আগে চামড়ার কাজ করিত, আজ চামড়া অন্য দেশে পাকাইয়ের জন্য চালান যাইতেছে। তাঁতীদের কারবারও কলের সুতার উপরে নির্ভর করে বলিয়া, কখনও চলে কখনও চলে না। কলের মালিকদের প্রয়োজনের চাপে তাঁতীদের জীবন পরাধীন হইয়া গিয়াছে।

কামারের ব্যবসায়ও ভাল চলে না, বহু জিনিস কলে তৈয়ারি হইয়া সস্তায় শহরবাজারে বিক্রয় হয়। ফলে বিভিন্ন শিল্পিকুল দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে। কেহ ভূমিহীন চাষী বা মজুরে পরিণত হইয়াছে, কেহ দেশত্যাগী হইয়া শেষে কোথায় গিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহার আর খোঁজ পাওয়া যায় না।

মুচি চাষী হইয়াছে, ব্রাহ্মণ ঔষধের দোকান করিতেছে; কায়স্থ, সদ্‌গোপ, উগ্র ক্ষত্রিয় কোথাও চাকরি করিতেছে, কোথাও ছুতারের কারখানা, কোথাও জুতার দোকান খুলিয়াছে। বর্ণব্যবস্থা অনুসারে যাহার যাহা বৃত্তি ছিল, সে আর তাহা ধরিয়া থাকিতে ভরসা পায় না। ফলে জাতিভেদ অর্থনীতির ক্ষেত্র পরিহার করিয়া শুধু সামাজিক ক্রিয়া-করণে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

শুধু শহরবাজারেই এমন পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা নহে। গ্রাম-দেশেও উপরোক্ত আর্থিক এবং সামাজিক বিপ্লবের ফলে গ্রাম্যসমাজও রূপান্তরিত হইতে বসিয়াছে। বাঙলা দেশে এই পরিবর্তন কোন্ ধারা অবলম্বন করিয়াছে, তাহার গতির কোনও দিশা পাওয়া যায় কিনা, তাহার সংখ্যামূলক আলোচনা করিবার পূর্বে আমরা বীরভূমের একটি গ্রামের লোকসংখ্যা ও বৃত্তিবিচার করিয়া বর্তমান অধ্যায় শেষ করিব।

বীরভূম জেলার উত্তরভাগে, মুর্শিদাবাদ জেলার সীমারেখার নিকটে ঘাজিগ্রাম নামে একটি প্রাচীন গ্রাম আছে। আজ সেখানে ২০৬৫ লোকের বাস। ইহাদের সংখ্যা ও বৃত্তির তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

পাঠক লক্ষ্য করিবেন, গ্রহাচার্য, কুমোর, ডোম, জেলে, কামার, ছুতার, নাপিত প্রভৃতি জাতি মোটামুটি স্ববৃত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত আছে। মুচি মজুর হইয়াছে, রাজবংশী মাছ না ধরিয়া মজুরি করে, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য চাষের দিকে মন দিয়াছে; মোটের উপরে স্ববৃত্তি হইতে যেন চাষ এবং মজুরির দিকে ঝোঁক বেশি দেখা যাইতেছে। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার মত আছে ঃ যেসকল জাতির জল চলে না, তাহাদের সংখ্যা ২০৬৫-এর মধ্যে ১৪৮৫ জন অর্থাৎ টাকায় ॥৶১০ মত লোক সমাজে

অধঃপাতিত অবস্থায় রহিয়াছে এবং মজুরের মধ্যে তাহাদেরই সংখ্যা বেশি।

থানা মুরারই অন্তর্গত ৯নং ইউনিয়ন খাজিগ্রাম মধ্যে খাজগ্রামের মোটামুটি বিবরণ

	লোকের শ্রেণী		পরিবার-সংখ্যা	লোক-সংখ্যা	পেশা
১	মুচি	(অজলচল)	৬৫	৩২৫	মজুর শ্রেণী
২	ভুঁইমালি	(ঐ)	৪০	১৫০	স্ববৃত্তি ও মজুর ও দুই ঘর চাষী
৩	ফুলমালি	(ঐ)	৭	২৫	মজুর শ্রেণী
৪	রাজবংশী	(ঐ)	১০	৩৫	মজুর শ্রেণী
৫	ভড়	(ঐ)	১২	৩৫	স্ববৃত্তি চিড়া তৈরি ও মজুর
৬	মাল	(ঐ)	৮০	৪০০	মজুর শ্রেণী
৭	কোনাই	(ঐ)	১৫	৩৫০	মজুর শ্রেণী, ৫ ঘর চাষী
৮	বাউরি	(ঐ)	১	৫	মজুর
৯	ডোম	(ঐ)	৫	২০	স্ববৃত্তি
১০	কোঁড়া সাঁওতাল	(ঐ)	২৫	৬৫	মজুর শ্রেণী
১১	জেলে	(ঐ)	১১	৫৫	স্ববৃত্তি, ২ ঘর চাষ
১২	বৈরাগী		৫	১৫	স্ববৃত্তি, ১ ঘর চাষ
১৩	গ্রহাচার্য		১	৫	স্ববৃত্তি
১৪	গোয়ালা		৮	২৫	স্ববৃত্তি ও চাষ
১৫	সদ্‌গোপ		৫	১০	মজুর
১৬	কুমোর		৪	১০	স্ববৃত্তি
১৭	কামার		৬	২০	স্ববৃত্তি, ১ ঘর চাকরি
১৮	ছুতার		১	৫	স্ববৃত্তি
১৯	নাপিত		৭	৩০	স্ববৃত্তি
২০	রাজপুত		৪	১৫	মজুর শ্রেণী
২১	বেনে		২	৫	স্ববৃত্তি ও চাষ
২২	বারুই		৪০	২০০	চাষ ও স্ববৃত্তি, ২ ঘর মুদিখানার দোকান, ৩ ঘর চিকিৎসা ব্যবসায়ী ও বেকার
২৩	ছত্রি		৬	১৫	চাষ ও ১ ঘর চাকরি
২৪	ভট		২	১০	চাকরি
২৫	ধোপা	(অজলচল)	২	১০	স্ববৃত্তি
২৬	কায়স্থ		২৮	১২০	চাষ, চাকরি, ২ ঘর চিকিৎসা ব্যবসায়ী ও বেকার
২৭	বৈদ্য		১২	৫০	চাষ, কবিরাজী, চাকরি, বেকার
২৮	ব্রাহ্মণ		৩০	১৫০	চাষ, চাকরি, ১ ঘর ডাক্তার ও বেকার

একাদশ অধ্যায়

বর্ণব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা

ভারতবর্ষে লোকগণনা ১৮৭২ সালে আরম্ভ হয়। কিন্তু সে বৎসর গণনার কাজ বড় অসম্পূর্ণভাবে করা হইয়াছিল। ১৮৮১ সাল হইতে প্রতি দশ বৎসর অন্তর এই গণনা ভালভাবে করা হইতেছে। তাহার মধ্যে ১৯০১, ১৯১১, ১৯২১ ও ১৯৩১ এই চার সালে আমরা হিন্দু ও মুসলমান সমাজের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে নানাবিধ সংবাদ প্রাপ্ত হই। ইংরেজ জাতির সহিত আমাদের সম্বন্ধের প্রথম হইতে যদি অধিকৃত স্থানগুলিরও আদমসুমারি পাইতাম, তবে গত দুইশত বৎসরে ভারতবর্ষের সমাজের মধ্যে কি কি পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহার একটি পরিপূর্ণ চিত্র আঁকা সম্ভব হইত। যে সামান্য ত্রিশ চল্লিশ বৎসরের হিসাব পাওয়া যায়, এইবার তাহারই পর্যালোচনা করা যাক।

শ্রীযুক্তা প্রীতি মিত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ববিভাগে গবেষণাকালে যে মূল্যবান কাজ করিয়াছিলেন, সেই অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির উপরেই বর্তমানে আমাদের নির্ভর করিতে হইবে।

পাঠক পরবর্তী কয়েক পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত তালিকাগুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে কতকগুলি বিষয় লক্ষ্য করিবেন।

প্রথম, যে সকল জাতির উল্লেখ ১৯০১ হইতে ১৯৩১ পর্যন্ত আদমসুমারির মধ্যে পাওয়া যায়, অতএব যাহাদের সম্বন্ধে কোনও বিশ্লেষণ করা সম্ভব, তাহাদের মধ্যে কয়েকটি শ্রেণীবিভাগ করা চলে। বৈদ্য, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতির মধ্যে শিক্ষিতের হার বেশি। তাহাদের মধ্যে স্ববৃত্তিতে অধিষ্ঠিত লোকের হার কম, মধ্যবিত্তের সংখ্যা অধিক। এক, কায়স্থের মধ্যে কিছু চাষের প্রাদুর্ভাব আছে, নয়তো চাষের দিকে ব্রাহ্মণ বৈদ্য অগ্রসর হয় নাই। শিল্পের দিকেও ইহাদের গতি অতিশয় ক্ষীণ।

বৈদ্য: স্ববৃত্তি — চিকিৎসা

সাল	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
মোট জনসংখ্যা	৩১,৩৫৭	৮৮,২৯৮	১,০২,৮৭০	১,১০,৭০৯
তাহার মধ্যে যাহারা রোজগার করে		২১,১৩৩	২৪,১১৪	২৬,২৯২
যাহারা রোজগার করে তাহাদের হার, শতকরা		২৩·৯৩	২৩·৪৪	২৩·৮৩
শিক্ষিতের হার, শতকরা	৪৫·৬২	৫৩·২১	৫৭·৫২	৫১·৭৯
স্ববৃত্তি, শতকরা	৩৬·১৩	২৩·১১	১৫·০২	১৮·৮৩
চাষ, মজুরি প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত, শতকরা		৭·১৬৩	১২·৪১৮	৬·০৪
শিল্পে নিযুক্ত, শতকরা		২·১৩	১·২২	১·৮৫
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাজে নিযুক্ত, শতকরা—(চাকরি, ডাক্তারি, ওকালতি, জমির উপস্বত্বের উপরে নির্ভর ইত্যাদি) ...		৫৪·৬৬৩	৪৬·৮১১	৪৯·৪৩

বারুই: স্ববৃত্তি — পানের চাষ ও ব্যবসায়

সাল	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
মোট জনসংখ্যা		১,০১,১১২	১,৮৫,৫২৬	১,৯৫,৯৩৯
তাহার মধ্যে যাহারা রোজগার করে		৩৯৮৪	৫৬৪২২	৫৩৭৫৪
যাহারা রোজগার করে তাহাদের হার, শতকরা		৩০·৬৮	৩০·৪২	২৬ ৩১
শিক্ষিতের হার, শতকরা	১২·৯৩	১৫·২৯	২০·০২	১৭ ৩১
স্ববৃত্তি, শতকরা	৯৪·৯৬	৬১·১৮	৪৪·১৫	৫৪ ৫৮
চাষ, মজুরি প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত, শতকরা		৭৫·৩১১	৭০·৭৪	৭৩ ৬৮
শিল্পে নিযুক্ত, শতকরা		৯৫	৩·৪৬৭	৩ ৮৮
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাজে নিযুক্ত, শতকরা—(চাকরি, ডাক্তারি, ওকালতি, জমির উপস্বত্বের উপরে নির্ভর ইত্যাদি) ...		২·০৭	৩·৭৫৭	৬৭০

বাউরি: স্ববৃত্তি — মজুরি

সাল	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
মোট জনসংখ্যা	২,৬০,৪৯৪	২,৫৭,৬৬৯	,০৩,০১৩	৩,০১,২০৮
তাহার মধ্যে যাহারা রোজগার করে		১,৬১,৯১৪	,৬৪,৮৮১	১,৪৩,৪৬৮
যাহারা রোজগার করে তাহাদের হার, শতকরা		৬২·৮২	৫৪·৪৩	৪৩·০২
শিক্ষিতের হার, শতকরা	০·০৮	০·৯৯	০·৫৯	০·৭৭
স্ববৃত্তি, শতকরা	৩৭·২৫	৫২·০২	৬৩·১৬	৪০·৭৯
চাষ, মজুরি প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত, শতকরা		৫৯·৫২	৭৯·১৭	৬৫·৯৪
শিল্পে নিযুক্ত, শতকরা		৮·২১	২·৯৯৭	৪·০৭
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাজে নিযুক্ত, শতকরা—(চাকরি, ডাক্তারি, ওকালতি, জমির উপস্বত্বের উপরে নির্ভর ইত্যাদি) ...		০·০৭৪৬	০·০৪৬	৭৮২

ব্রাহ্মণ: স্ববৃত্তি — যজন ।। ইত

সাল	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
মোট জনসংখ্যা	১০,১৯,০৩৮	১১,৯১,৮৬৭	১৩,১৪,৪০০	১৪,৫৬,১৮০
তাহার মধ্যে যাহারা রোজগার করে		৪,০০,০৬৪	৪,২৫,১৭৩	৪,১৭,১৫৭
যাহারা রোজগার করে তাহাদের হার, শতকরা		৩৩·৫৮	৩২·৩৬	২৮·৬৮
শিক্ষিতের হার, শতকরা	৮৪	৩৯·৮৫	৪৩·১৫	৩৭·২৮
স্ববৃত্তি, শতকরা	৫৪	২১·৭৯	১৪·৫৭	১৬·৫৭
চাষ, মজুরি প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত, শতকরা		১৯·৩৮৮	২২·৬৩১	১৫·৩৮
শিল্পে নিযুক্ত, শতকরা		২·৯২	৩·৫৭	৪·৫০
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাজে নিযুক্ত, শতকরা—(চাকরি, ডাক্তারি, ওকালতি, জমির উপস্বত্বের উপরে নির্ভর ইত্যাদি) ...		৪৩·৭১২	৩৪·১৬	৩৩·৭৬

চামার ও মুচি: স্ববৃত্তি — চামড়া খালানো, পাকানো ও চামড়ার জিনিস তৈয়ারি

সাল	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
মোট জনসংখ্যা	৯৬,৩৯১	৫,৩৩,১৩১	৫,৬৪,৮৭৯	৫,৬৪,৬৮২
তাহার মধ্যে যাহারা রোজগার করে	(শুধু চামার)	২,৩৮,০৫৮	২,৪৪,১৪৫	২,১৭,৩৬৬
যাহারা রোজগার করে তাহাদের হার, শতকরা		৪৪·৬৭	৪৩·২১	৩৮·৫০
শিক্ষিতের হার, শতকরা	৩ ১৯	২·৯৭	৩·১১	৪·৫২
স্ববৃত্তি, শতকরা	২৩ ২৬	৩৩·৭৭	২৩·৯৪	২৪·৫৯
চাষ, মজুরি প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত, শতকরা	৩৩ ৪৭	৩২·৩৩	২৮·৬০	৩২·৮৮
শিল্পে নিযুক্ত, শতকরা		৩৭·০৬	৪২·৮৪	৪৩·৯৩
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাজে নিযুক্ত, শতকরা—(চাকরি, ডাক্তারি, ওকালতি, জমির উপস্বত্বের উপরে নির্ভর ইত্যাদি) ...		২৫৪	৪৪৯	৩৭১

ধোপা: স্ববৃত্তি — কাপড়কাচা

সাল	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
মোট জনসংখ্যা		২,০৪,১৩৮	২,২৭,২৯৫	২,২৯,৬০৮
তাহার মধ্যে যাহারা রোজগার করে		৮০,৪২৯	৮৮,৬৯১	৭৩,৪৫৬
যাহারা রোজগার করে তাহাদের হার, শতকরা		৩৯·৪২	৩৯·০১	৩২·০০
শিক্ষিতের হার, শতকরা	৫	৫·৫১	৭·৭৮	৮·১১
স্ববৃত্তি, শতকরা	৫৯	৫৩ ৯৩	৪২·৮১	৪৮·৭১
চাষ, মজুরি প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত, শতকরা		৩৩ ৫০	৩৬·৩৩	২৯·৬৪
শিল্পে নিযুক্ত, শতকরা		৩ ৮২	৪·২১	৫·৪১
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাজে নিযুক্ত, শতকরা—(চাকরি, ডাক্তারি, ওকালতি, জমির উপস্বত্বের উপরে নির্ভর ইত্যাদি) ...		১৪২	৮৪৯	০৬৯

গোয়ালা : স্ববৃত্তি — গো-পালন ও দুধের ব্যবসায়

সাল	১৯০১	১৯১১		
মোট জনসংখ্যা	৪,৯৪,৬৯৯	৫,৮৩,৭৯০	৫,৮২,৫৯৭	৫,৯৯,২৮১
তাহার মধ্যে যাহারা রোজগার করে		২,৫১,৮২৯	২,৩৯,৪২৯	২,১৭,৪৩৮
যাহারা রোজগার করে তাহাদের হার, শতকরা		৪৩·১৩	৪১·১০	৩৬·২৮
শিক্ষিতের হার, শতকরা	৬·৩৩	৭·৬৮	১০·৫৭	১০·১৭
স্ববৃত্তি, শতকরা	৪১·৪৫	৩১·৩৯	২১·৩০	২৪·৭৭
চাষ, মজুরি প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত, শতকরা		৪১·০০	৪২·২১	৩৭·৪৯
শিল্পে নিযুক্ত, শতকরা		৬·৪৭	৭·৪৩	৭·২৮
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাজে নিযুক্ত, শতকরা—(চাকরি, ডাক্তারি ওকালতি, জমির উপস্বত্বের উপরে নির্ভর ইত্যাদি)		৬৫০	৮৭৩	৪২১

যোগী : স্ববৃত্তি — তাঁতের কাজ

সাল	১৯০১	১৯১১		১৯৩১
মোট জনসংখ্যা	৩,৭৩,১০৫	৩,৪২,৮৩৩	৩,৬৫,৮৯১	৩,৮৪,৬৩৪
তাহার মধ্যে যাহারা রোজগার করে		১৯,২৩৪	১,২৭,৫৭৭	১,০৭,৯৫২
যাহারা রোজগার করে তাহাদের হার, শতকরা		৩৪·৭৭	৩৪·৮৬	২৮·০৮
শিক্ষিতের হার, শতকরা	৭·৬১	১২·৯৭	১৫·৪৪	১১·০৬
স্ববৃত্তি, শতকরা	৫৩·৮৮	৩৬·০৯	৩৬·২৫	৪০·৮২
চাষ, মজুরি প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত, শতকরা		৩২·৯৩	৩২·৬২	২৪·০৯
শিল্পে নিযুক্ত, শতকরা		৪২·৪৭	৪০·২৩	৪৯·৪১
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাজে নিযুক্ত, শতকরা—(চাকরি, ডাক্তারি, ওকালতি, জমির উপস্বত্বের উপরে নির্ভর ইত্যাদি)		৭১২	০৫	৮৩৪

নমঃশূদ্র: স্ববৃত্তি — চাষ এবং নৌকা চালানো

সাল	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
মোট জনসংখ্যা	১৭,৯৬,২২০	১৮,২৬,১৩৯		২০,৯৪,৯০৬
তাহার মধ্যে যাহারা রোজগার করে		৬,০৯,২৫৫		৫,৫২,৭৯৬
যাহারা রোজগার করে তাহাদের হার, শতকরা		৩৩·৩৬		২৬·৩৮
শিক্ষিতের হার, শতকরা	৩·৩০	৪·৯১	৭·৫১	৬·৬৪
স্ববৃত্তি, শতকরা	৮৮·০২	৭৫·১৯		
চাষ, মজুরি প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত, শতকরা		৭৭·৪৯		৭০·৪৫
শিল্পে নিযুক্ত, শতকরা		৭·২০		৪·৯৪
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাজে নিযুক্ত, শতকরা—(চাকরি, ডাক্তারি, ওকালতি, জমির উপস্বত্বের উপরে নির্ভর ইত্যাদি) ...		১·০৯২		৬·০২৮

নাপিত: স্ববৃত্তি — ক্ষৌরকর্ম

সাল	১৯০১	১৯১১		
মোট জনসংখ্যা	৩,৮৫,৯৮৪	৪,২৭,৪৮৮	৪,৪৪,০২৩	৪,৫১,০৮৫
তাহার মধ্যে যাহারা রোজগার করে		১,৫০,৮৬০	১,৫১,০৩৭	১,৩৩,৮৯৮
যাহারা রোজগার করে তাহাদের হার, শতকরা		৩৫·৩০	৩৪·০২	২৯·৬৮
শিক্ষিতের হার, শতকরা	৯·৭৯	১১·০৪	১৩·৪৭	১১·৫৮
স্ববৃত্তি, শতকরা	৬০·৫৫	৪৮·৪১	৩৬·৭০	৪৫·৪১
চাষ, মজুরি প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত, শতকরা		৩৩·৯৫	৩২·২৯	২৭·০১
শিল্পে নিযুক্ত, শতকরা		৪·৮১	৪·২১	৫·৬৪
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাজে নিযুক্ত, শতকরা—(চাকরি, ডাক্তারি ওকালতি, জমির উপস্বত্বের উপরে নির্ভর ইত্যাদি) ..		২৮১	২৩০	৪৪৯

বাগদি বা ব্যগ্রক্ষত্রিয়: স্ববৃত্তি — চাষ ও মাছধরা

সাল	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
মোট জনসংখ্যা … … … …	৭,০৩,১৪৭	৮,৪৭,২২৮	৮,৮৬,৮২১	৯,৮৭,৩১৫
তাহার মধ্যে যাহারা রোজগার করে … … …		৩,৯২,৪৭২	৩,৭১,৪৭৭	৩,৬৬,৪৫৫
যাহারা রোজগার করে তাহাদের হার, শতকরা … …		৪৬·৩৩	৪৪·১৫	৩৭·১৩
শিক্ষিতের হার, শতকরা … … … …	১·৫৭	১·৯১	২·১৩	১·৯২
স্ববৃত্তি, শতকরা … … … …	৭০·১৩	৭১·২৮	৪২·২৮ (?)	৬৯·৭৯
চাষ, মজুরি প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত, শতকরা … …		৭৩·৪১	৬৮·৬৬	৮১·৭৪
শিল্পে নিযুক্ত, শতকরা … … … …		১০·০৫	৯·২৩	৫·০৩
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাজে নিযুক্ত, শতকরা—(চাকরি, ডাক্তারি, ওকালতি, জমির উপস্বত্বের উপরে নির্ভর ইত্যাদি) …		০·২৪৭	৩৫৫	১·১৭১

কামার: স্ববৃত্তি — লোহার কাজ

সাল	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
মোট জনসংখ্যা … … … …	১,৭৬,৮৭৩	২,৩৮,৫৯৫	২,৫৬,৮৫৩	২,৬৫,৫২৬
তাহার মধ্যে যাহারা রোজগার করে … … …		৮৬,৯০২	৮৯,৬৩৩	৮১,৭১০
যাহারা রোজগার করে তাহাদের হার, শতকরা … …		৩৬·৩৮	৩৪·৫৯	৩০·৭৭
শিক্ষিতের হার, শতকরা … … … …	১০·৩৪	১৪·৯৮	১৭·৮৮	১৪·৯১
স্ববৃত্তি, শতকরা … … … …	৪৭·৩৫	৫৭·৪৮	৩৪·১১	৪৩·৭৬
চাষ, মজুরি প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত, শতকরা … …		১৯·৩০	২৬·০২	২১·৮১
শিল্পে নিযুক্ত, শতকরা … … … …		৬৭·৫৩	৫২·০৪	৫৬·১১
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাজে নিযুক্ত, শতকরা—(চাকরি, ডাক্তারি, ওকালতি, জমির উপস্বত্বের উপরে নির্ভর ইত্যাদি) …		৭৪৫	১·২৯০	৩২১

কায়স্থ: স্ববৃত্তি — হিসাবপত্র বা অন্য লেখার কাজ

সাল	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
মোট জনসংখ্যা	৮,৪৫,৯৬৮	১০,২৩,৭৩৪	×	১৫,৫৮,৪৪২
তাহার মধ্যে যাহারা রোজগার করে		৩,০৫,১৯০		৪,১১,৬৫৭
যাহারা রোজগার করে তাহাদের হার, শতকরা		২৯·৮০		২৬·৪২
শিক্ষিতের হার, শতকরা	৩০·৮৬	৩৪·৭৫	৩৬·৫৭	৩২·৯০
স্ববৃত্তি, শতকরা		১০·৫৪		১২·৬৪
চাষ, মজুরি প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত, শতকরা		৩৩·৮৩		২০·২৩
শিল্পে নিযুক্ত, শতকরা		৫·০৯		৫·১৬
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাজে নিযুক্ত, শতকরা—(চাকরি, ডাক্তারি, ওকালতি, জমির উপস্বত্বের উপরে নির্ভর ইত্যাদি) ...	•	২১·৩৫		২২·৪২

কুমোর: স্ববৃত্তি — হাঁড়িকুঁড়ি গড়া

সাল	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
মোট জনসংখ্যা	১,৯৫,৫৩৩	২,৭৮,২০৬	৮৪,৫১৪	৮৯,৬৫৪
তাহার মধ্যে যাহারা রোজগার করে		৯২,৬৫৯	৭৫,০২৬	৫৩,৫০৬
যাহারা রোজগার করে তাহাদের হার, শতকরা		৩৩·০২	২৬·৪৮	১৮·৪৭
শিক্ষিতের হার, শতকরা	৬·৫৬	৮·০৪	১০·১৮	৯·৬৬
স্ববৃত্তি, শতকরা	৭৫·১৬	৭৩·৮০	৬১·৬৯	৫৮·৮৭
চাষ, মজুরি প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত, শতকরা	১৬·৬০	১৩·৪০	১৯·৭৬	১১·৮৯
শিল্পে নিযুক্ত, শতকরা		৭৮·১৪	৬৪·৫০	৬৫·৬৬
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাজে নিযুক্ত, শতকরা—(চাকরি, ডাক্তারি, ওকালতি, জমির উপস্বত্বের উপরে নির্ভর ইত্যাদি) ...		৮৫৭	২৮৮	২৫৭

যে সকল জাতির মধ্যে শিক্ষিতের হার খুব ক্ষীণ, তাহাদের গতি দুই মুখে অথবা তিন মুখে চলিয়াছে। চামার ও মুচি স্ববৃত্তিতে মাঝারি সংখ্যায় রহিয়া গিয়াছে, চাষীর সংখ্যাও তাহাদের মধ্যে মন্দ নয়। তাহারা হাতের কাজ করিত, স্ববৃত্তি কমিয়া আসায় অন্যান্য হাতের কাজের দিকে ঝুঁকিবার ফলে, তাহাদের মধ্যে শিল্পের উপর নির্ভরশীল লোকের হার ঊর্ধ্বমুখী হইয়া আছে। কামারদের মধ্যে শিক্ষিতের হার অপরাপর শিল্পীকুল অপেক্ষা অধিক হওয়ার জন্য এবং তাহাদের দক্ষতার জন্য, স্ববৃত্তিতে অধিষ্ঠান কমিয়া আসিলেও তাহাদের অন্য শিল্পবৃত্তির দিকে যাওয়া সহজ হইয়াছে।

সমাজের সেবক, ধোপা বা নাপিতের মধ্যে স্ববৃত্তিতে অধিষ্ঠিত লোকের হার এখনও কম নয়। চাষের দিকেও তাহাদের গতি মধ্যম, কিন্তু শিল্প বা মধ্যবিত্ত বৃত্তিগুলির দিকে তাহাদের গতি ক্ষীণ।

বাগদি, বাউরি অথবা নমঃ প্রভৃতি জাতি পূর্বেও যেমন অশিক্ষিত ছিল, আজও তেমনই রহিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে চাষ ও মজুরিতে অধিষ্ঠিতদের সংখ্যা বেশ উচ্চ। তাহাদের মধ্যে মধ্যবিত্তের বৃত্তি অথবা শিল্পের অভিমুখে গতি অতিশয় ক্ষীণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

মোটের উপর বলা চলে যে, ইংরেজী শাসন এবং ধনতন্ত্র বিস্তারের ফল বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন আকারে দেখা দিয়াছে। যাহারা পূর্বেও চাকরি করিত, আজও তাহারা চাকরি করিতেছে। যে সকল শিল্প ধনতন্ত্রের আঘাতে পর্যুদস্ত হইয়াছে সেই সকল জাতির মধ্যে পরিবর্তনের মাত্রা বেশি। বিদেশে চামড়া চালান দেওয়ার ফলে মুচির বৃত্তি অনেকাংশে নষ্ট হইয়াছে, তাহারা স্ববৃত্তি খানিক অংশে ত্যাগ করিয়া চাষ বা অন্য শিল্পে মজুরি করিতেছে। বিদেশী ও স্বদেশী মিলের সহিত প্রতিযোগিতা আরম্ভ হওয়ায় যোগীকে চাষের দিকে ঝুঁকিতে হইয়াছে; কিন্তু এখনও তাঁতের কাপড়ের বাজার আছে বলিয়া তাহারা স্ববৃত্তি সম্পূর্ণ পরিহার করে নাই। কিন্তু কুমোরের হাঁড়িকুড়ি সস্তা হওয়ায় বিলাতি শিল্পের আঘাতে তাহা আজও বিধ্বস্ত হয় নাই; বহু কুমোর স্ববৃত্তির দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করিতেছে।

সমগ্র সমাজের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আমরা যে শিক্ষা লাভ করিলাম, এবার বিভিন্ন জাতির আধুনিক কালের আভ্যন্তরীণ ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া আমরা হিন্দু সমাজের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আরও পূর্ণ করিব।

দ্বাদশ অধ্যায়

বিভিন্ন জাতির মধ্যে সামাজিক আন্দোলন

যোগীজাতি

যোগী জাতির সংখ্যা বাঙলা দেশে প্রায় চার লক্ষের কাছাকাছি হইবে। ১৯৩১ সালে তাহার মধ্যে ত্রিপুরায় শতকরা ২২.০৮, নোয়াখালিতে ১৭.১০, মৈমনসিংহে ১১.৮৩, চট্টগ্রামে ৯.৮২, বাখরগঞ্জে ৫·৭৪ , ঢাকাতে ৫.৫৫ , এবং খুলনায় ৩.২৩ জনের বাস। অবশিষ্ট শতকরা প্রায় ২৫ জন বাঙলা দেশের অন্যান্য জেলায় ছড়াইয়া আছেন। যোগীদের মধ্যে তাঁতের ব্যবসায় স্ববৃত্তি বলিয়া পরিগণিত হয়। ইতিপূর্বে যোগীদের সম্পর্কে যে তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে স্ববৃত্তিতে অধিষ্ঠিত যোগীর সংখ্যা ১৯০১এ শতকরা ৫৩.৮৮, ১৯১১এ ৩৬·০৯ , ১৯২১এ ৩৬.২৫ এবং ১৯৩১ সালে ৪০.৮২ দাঁড়ায়। চাষের দিকে অথবা অন্যান্য বৃত্তির অভিমুখে সংখ্যার দিক দিয়া যোগীদের জাতিতে আভ্যন্তরীণ সামাজিক আন্দোলনের ধারা কোন্ দিকে প্রবাহিত হইতেছে, উহা বিশ্লেষণ করিলে আমরা অনেক শিক্ষণীয় বিষয় পাই।

যোগীজাতির মধ্যে বর্তমানকালে সামাজিক চেতনার প্রমাণ সন ১২৭৯ (খৃঃ ১৮৭২) সালে প্রথম পাওয়া যায়। সেই সময়ে কলিকাতার নিকটে আন্দুল-মৌড়ী গ্রামে কয়েকজন কৈবর্ত যোগীদের বাড়িতে অন্ন গ্রহণ করায় জাতিচ্যুত হন। ইহার ফলে যোগীদের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার হয় এবং তাঁহারা সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত সমাজের নিকট প্রশ্ন করেন, 'যোগী জাতি পবিত্র কি অপবিত্র এবং তাহাদিগের ব্যবহার কিরূপ?' যোগীজাতিকে পণ্ডিত সমাজ 'সদ্ব্যবহারযুক্ত' বলিয়া বর্ণনা করেন। ইহার পরে যোগীদের মধ্যে কেহ কেহ উপবীত ধারণ করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু সে আন্দোলন বিশেষ বিস্তারলাভ করে নাই। যোগীসখা

পত্রিকায় (ভাদ্র, ১৩১৩) প্রকাশ যে, ১২৮৪ বং (খৃঃ ১৮৭৭)তে ফাল্গুন মাসে লোনসিংহ গ্রামে ৭ জন উপবীত ধারণ করেন; চৈত্র মাসে রাজনগরে ২৪ জন এবং পরবর্তী বৎসর রাজগঞ্জে মাত্র ৭ জন ঐ পথ অনুসরণ করিয়াছিলেন। সন ১২৮৭তে (খৃঃ ১৮৮০) ভারতচন্দ্র শিরোমণি কর্তৃক লিখিত 'যোগী সংস্কার' নামে একখানি বই প্রকাশিত হয়।

১৯০১ সালের আদমসুমারিতে প্রথম বিস্তৃতভাবে হিন্দুসমাজের মধ্যে জাতিগুলির পৃথকভাবে গণনা করা হয়। তাহার পর ১৯০৯ সালে মিণ্টো-মরলি শাসন সংস্কার প্রবর্তিত হইল, সে সময়েও বিভিন্ন জাতি স্বীয় রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে পৃথকভাবে অতিমাত্রায় সচেতন হইয়া উঠিলেন। ইহার প্রমাণ আমরা ১৯০১ সাল হইতে পরবর্তী-কালের ইতিহাসে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাইয়া থাকি।

১৮৯১ সালে রিজলি 'ট্রাইব্‌স্‌ এণ্ড কাষ্ট্‌স্‌ অব বেঙ্গল' গ্রন্থে যোগীদের উদ্ভব সম্বন্ধে যে অসম্পূর্ণ মত প্রকাশ করেন, তাহার প্রতিবাদস্বরূপ যোগীসমাজের পক্ষ হইতে রিজলি সাহেবকে একখানি পত্র লেখা হইয়াছিল। ১৯০১এর আদমসুমারির পরে যোগী হিতৈষিণী সভা স্থাপিত হয়; কিন্তু কিছুদিন চলার পর উহা বন্ধ হইয়া যায়। যোগীসখা পত্রিকাখানি খৃঃ ১৯০৫ সালে আরম্ভ হয় (বৈশাখ, ১৩১১); ইহার প্রবন্ধাবলি পাঠ করিলে যোগীসমাজ কোন্‌ মুখে অগ্রসর হইতেছে, তাহার আভাস এবং প্রমাণ পাওয়া যায়। যোগীসখার উদ্দেশ্য হইল, যোগীসমাজের বিভিন্ন উপশাখার উচ্ছেদসাধন করিয়া জাতির মধ্যে একতার প্রতিষ্ঠা, জাতির সামাজিক মর্যাদার বৃদ্ধিসাধন এবং শিক্ষা, কৃষি, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারে সহায়তা করা। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে তাঁতশিল্পের দিকে দেশের মন যায় এবং যোগীজাতিও ইহাতে স্বীয় আর্থিক অবস্থার উন্নতির সম্ভাবনা দেখিতে পান (যোগীসখা, আশ্বিন, ১৩১৩)। ঐ সম্পর্কে আরও কিছু কিছু প্রবন্ধও প্রকাশিত হইতে থাকে, যথা 'শিল্প শিক্ষা' (অগ্রহায়ণ, ১৩১২), 'আমাদের উন্নতির মূলে কি কি আবশ্যক' (বৈশাখ, ১৩১৩)।

১৯০৯ সালে মিণ্টো-মরলি শাসনসংস্কার প্রবর্তিত হওয়ার সময়ে বিভিন্ন জাতির মধ্যে উন্নতির সম্ভাবনা ও আশা বিভিন্নভাবে দেখা দেয়। যোগীসখা, ভাদ্র, ১৩১৫ (খৃঃ ১৯০৮)এ দেখা যায়, জনৈক লেখক মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন ঃ 'জাতীয় উন্নতিতে এখন স্বার্থপর ব্রাহ্মণের একাধিপত্য নাই; পাশ্চাত্য উদারতা উপযুক্ততার পুরস্কার দিতেছে।' শ্রাবণ, ১৩১৮ (খৃঃ ১৯১১) সালে যোগীজাতির পক্ষ হইতে চাকুরি এবং ছাত্রবৃত্তির জন্য বিশেষ একটি আবেদন করা হয়। গভর্ণমেণ্টের নিকট বিশেষ প্রসাদলাভের প্রয়াস থাকার ফলে ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ বাধিবামাত্র যোগীসখায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় (ভাদ্র, ১৩২১—খৃঃ ১৯১৪)। তাহাতে লেখা ছিল ঃ 'আমরা এই ঘোর দুর্দিনে পিতৃস্বরূপ রাজার কার্যে সকলে আত্মদান করিতে পারিব না, কিন্তু যাঁহারা প্রাণ দিতে যাইতেছেন, তাঁহাদের সাহায্য করা কর্তব্য। গভর্ণমেণ্ট জানেন, আমরা অতি নিরীহ রাজভক্ত। রাজভক্তি প্রকাশের এমন সুবিধা আর হইবে না।' আবার জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়, ১৩২২ (খৃঃ ১৯১৫)তে লেখা হয়, 'দরিদ্র যোগীজাতি চিরকাল রাজভক্ত, রাজার মঙ্গলকামনাই আমাদের মূলমন্ত্র......আমরা ইংরাজের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।'

ইংরাজের প্রতি ভক্তি ও আনুগত্য স্বীকারের মূলে ছিল, কিছু রাজনৈতিক অধিকারলাভ এবং চাকুরি প্রভৃতির দ্বারা আর্থিক উন্নতির কিছু সম্ভাবনা। ইস্কুল কলেজের শিক্ষা বিস্তারের দিকে যোগীজাতির ঝোঁক বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আশ্বিন, ১৩১২ (খৃঃ ১৯০৫) সালে 'সামাজিক স্বাতন্ত্র্য' নামক প্রবন্ধে যোগীজাতির অবনত অবস্থার জন্য শিক্ষার অভাবকে বিশেষভাবে দায়ী করা হয়। কয়েকটি প্রবন্ধের শিরোনামা হইতে এ বিষয়ে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যাইতে পারে। 'বিদ্যাশিক্ষা ও একতার অভাব' (মাঘ, ১৩১২), 'শিক্ষা' (ফাল্গুন, ১৩১২), 'শিক্ষাই জাতীয় উন্নতির প্রধান সোপান' (ভাদ্র, ১৩১৩), 'আগে সাধনা পরে সিদ্ধি' (কার্তিক, ১৩১৪), 'শিক্ষা' (পৌষ, ১৩১৫)।

যোগী সম্মিলনী নামক প্রতিষ্ঠান গভর্ণমেণ্টের নিকট বৃত্তির জন্য আবেদন জানান (যোগীসখা, শ্রাবণ, ১৩১৮—খৃঃ ১৯১১); মৈমনসিংহে একটি ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠিত হয় (অগ্রহায়ণ, ১৩২১—খৃঃ ১৯১৪)।

ছাত্রদের সাহায্যার্থ কিছু চাঁদাও সংগ্রহ করা হইয়াছিল। হয়তো এই সকল কারণেই জাতির মধ্যে শিক্ষার অনুপাত কিয়দংশে বৃদ্ধি পায়।

১৯০১	...	...	...	৭·৬১
১৯১১	...	...	...	১২.৯৭
১৯২১	...	...	...	১৫.৪৪
১৯৩১	...	...	...	১১.৩৬

কলেজী শিক্ষা এবং চাকুরির দিকে গতি কথঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য যোগীসমাজে স্বভাবতই আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা পরিলক্ষিত হয়। যোগীজাতির প্রাচীন ইতিহাস লইয়া গবেষণা আরম্ভ হয় এবং ১৯১১ সালের আদমসুমারির পূর্বে সেনসাস কমিশনার সাহেবের জন্য শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ প্রণীত 'বঙ্গীয় যোগীজাতি' নামক একখানি পুস্তক উপহার প্রেরিত হয়। যোগী-সখাতেও নানা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে থাকে।

'প্রত্নতত্ত্ব'—বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, ভাদ্র, ১৩১২
'যোগীজাতির ঐতিহাসিকতা'—আশ্বিন, ১৩২৭, কার্তিক, ১৩২৮
'আলোক রশ্মি'—বৈশাখ, ১৩৩০
'তোমরা কে'—মাঘ,১৩১৭
'অধঃপতন ও প্রতিকার'—ভাদ্র, ১৩২৭

১৯২১ সালে আদমসুমারির সময়ে যোগীজাতির পুরোহিতগণ ব্রাহ্মণবর্ণে গণ্য হইবার দাবি পেশ করেন; ১৯৩১ সালে সমগ্র যোগী-জাতি ব্রাহ্মণত্বের দাবি জানান।

যোগী সম্মিলনীর আন্দোলনের ফলে উপবীত ধারণ কিয়দংশে সার্থক হয়, কিন্তু উহা আশানুরূপ বিস্তারলাভ করিতে পারে নাই।

সামাজিক মর্যাদার দাবির সঙ্গে সঙ্গে যোগীসমাজে আভ্যন্তরীণ সংস্কারের জন্যও চেষ্টা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যোগীসখায় 'উপনয়ন সংস্কার' (ভাদ্র, ১৩২১), 'উপবীত প্রচলন' (বৈশাখ, ১৩২৮) প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বৈশাখ, ১৩১৮ এবং জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০তে যোগীদের

মধ্যে পুরোহিতগণ যাহাতে সত্যই শিক্ষালাভ করেন এবং স্ববৃত্তির জন্য যোগ্যতা অর্জন করেন, তাহার বিষয় লেখা হইতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে যোগীদের মধ্যে উপজাতিগুলি তুলিয়া দিবার জন্য আবেদন প্রকাশিত হইতে থাকে এবং বাল্যবিবাহ বন্ধ করিবার বিষয়েও জনমত গঠনের চেষ্টা চলিতে থাকে। ('পরিণয় সংস্কার'—আশ্বিন, ১৩৩৮; 'বাল্যবিবাহ'—বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২)। স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়।

'স্ত্রীজাতির প্রতি আমাদের কর্তব্য'—অগ্রহায়ণ, ১৩২৭।
'স্ত্রী-শিক্ষা'— মাঘ, ১৩২৭।
'ভগ্নীবৃন্দের প্রতি নিবেদন'—মাঘ, ১৩২৭।
'মেয়েরা কি মানুষ হবে না'—ভাদ্র, ১৩৩০।
'নারী সমস্যা'—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১।

বিধবা বিবাহ হওয়া উচিত কিনা, এই প্রশ্ন লইয়া দুইটি মত দেখা দেয়। তাহার মধ্যে প্রাচীনপন্থিগণের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও অগ্রগামী সমাজ কিছু বিধবার পরিণয়দানে সক্ষম হন।

উপরে যোগীসমাজের মধ্যে যে গতির পরিচয় আমরা পাইলাম, তাহার মধ্যে শিল্পে উন্নতি অপেক্ষা গভর্ণমেণ্টের নিকট অন্যান্য জাতির সহিত চাকুরি প্রভৃতিতে অধিকারের ব্যাপারই সমধিক পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টার মধ্যে এইটুকু দেখা যায়, ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ ইতিমধ্যে যে পথে চলিয়াছিলেন, যোগিগণ সেই দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যোগী সম্প্রদায়ের বৃত্তি বস্ত্রশিল্প হইলেও সে বিষয়ে উন্নতির আভাস অল্পই পাওয়া যায়। কেবল স্বদেশী আন্দোলনের ফলে ক্ষণিকের আলোর মত জাতির মধ্যে বয়ন শিল্পের দ্বারা আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা দেখা দিলেও যোগীজাতি স্থায়ীভাবে তাহার উপরে যেন নির্ভর করিতে পারিতেছিলেন না।

বৈশাখ, ১৩১৩ (খৃঃ ১৯০৬) সালে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে লেখা হইয়াছিল ঃ 'স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে দিশী বস্ত্রের আদর হইয়াছে। ইহার অবলম্বনে আর্থিক উন্নতিসাধন করিতে হইবে। হ্যাণ্ডলুম ও

ফ্লাই-শাটল প্রভৃতি যে সকল কলের তাঁত আমদানী হইয়াছে, তাহার দ্বারা কাজ করিতে শিক্ষা করিলে অতি অল্প সময়ে সুন্দর সুন্দর বস্ত্র বয়ন করা যাইতে পারিবে।'

কিন্তু হয়তো তাঁত শিল্পের উত্থান-পতন অতি অনিশ্চিত হওয়ায় অন্যদিকেও যোগীজাতিকে পথের সন্ধান করিতে হইতেছিল। যোগীসখা, বৈশাখ, ১৩২১ (খৃঃ ১৯১৪)এ প্রশ্ন করা হয়, যাহারা উপবীত গ্রহণ করিতেছে, তাহাদের দ্বারা চাষ কি সম্ভব হইবে? উত্তরে প্রকাশ যে, যে-কোনও শিল্পে বা ব্যবসায়ে লাভ হওয়া সম্ভব, সেই দিকেই সকলের অগ্রসর হওয়া উচিত।

যোগীজাতির আধুনিক ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, স্ববৃত্তিতে অনেকে নিয়োজিত থাকিলেও অধিকতর উন্নতির আশায় এবং সামাজিক মর্যাদার উৎকর্ষের জন্য এই শিল্পী জাতিটি কিরূপে স্বীয় সমাজসংস্কারের চেষ্টার ভিতর দিয়া ক্রমশ মধ্য-বিত্ত চাকুরিজীবী ব্রাহ্মণ, বৈদ্য বা কায়স্থ সমাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে যোগীদের মধ্যে সামাজিক উপজাতিগুলির সংশ্লেষ ঘটাইয়া ঐক্যবদ্ধ যোগীজাতি গঠনের চেষ্টা চলিতেছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, দেশের শাসনব্যবস্থার মধ্যে হিন্দুদের মধ্যে বিভিন্ন জাতির জন্য অধিকারের কিছু তারতম্য সৃজন করিবার ফলে ১৯০৯ সালে শাসন-সংস্কারের পূর্বে জাতিকে আশ্রয় করিয়া যে চেতনা অস্পষ্টভাবে ছিল, তাহাই যেন পরবর্তীকালে আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

নমঃশূদ্র

বাঙলাদেশে, বিশেষত পূর্ববঙ্গে, যেখানে নদী অথবা খালবিলের প্রাদুর্ভাব, নমঃশূদ্র জাতির প্রাদুর্ভাব সেই সকল জায়গায় বেশি। হিন্দু-সমাজ চিরদিন এই কৃষিজীবী জাতিকে ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে, এমন কি অস্পৃশ্য বলিয়া গ্রামের প্রান্তে ভিন্ন পল্লীতে বাস করিতে বাধ্য

করিয়াছে। নমঃশূদ্রগণের স্ববৃত্তি বলিতে কৃষি ভিন্ন নৌকাচালনাকেও বুঝায়।

যোগীজাতির স্ববৃত্তি অনেকাংশে লোপ পাইয়াছে, কিন্তু নমঃশূদ্র-গণের স্ববৃত্তি অত অধিক পরিবর্তিত হয় নাই। তাঁহাদের মধ্যেও শিক্ষা অতি অল্প পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সামাজিক মর্যাদালাভের আকাঙ্ক্ষা স্বভাবত দেখা দিয়াছে। কিন্তু যোগীজাতির মধ্যে যাহা ঘটে নাই, নমঃশূদ্রদের মধ্যে সেইরূপ একটি পরিণতির লক্ষণ আত্মপ্রকাশ করিল। নমঃশূদ্র জাতির সংখ্যা অল্প নহে এবং ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, খুলনা, যশোহর প্রভৃতি জেলার এক এক বৃহৎ অংশে ইঁহাদের বিস্তৃত বসতি আছে। কতকটা এই কারণে এবং কতকটা শিক্ষালাভের পরে বর্ণহিন্দুদের নিকট অপমানের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ নমঃশূদ্রগণ হিন্দু-সমাজ হইতে পৃথক জাতি এবং গভর্ণমেণ্টের বিশেষভাবে অনুগ্রহের পাত্র বলিয়া দাবি জানান। নমঃশূদ্রগণের মধ্যে 'নমঃশূদ্র হিতৈষণী সমিতি' নামে যে প্রতিষ্ঠান আছে, অথবা 'পতাকা', 'নমঃশূদ্র সুহৃদ' প্রভৃতি যে সকল পত্রিকা প্রকাশিত হয়, সেগুলি বিবেচনা না করিয়া আমরা কেবল একটি বিষয়ে লক্ষ্য নিবন্ধ করিব।

শ্রীরাইচরণ বিশ্বাস নামে জনৈক লেখক নমঃশূদ্র সুহৃদ (জানুয়ারি, খৃঃ ১৯০৮) পত্রিকায় লেখেন :

> আমরা ব্রাহ্মণের জাতি, হিংসা হেতু হউক বা ক্রোধবশত হউক, আমাদিগকে অনেকে না ভালবাসিতে পারেন, কিন্তু যুগান্তর ধরিয়া আমাদের ব্রাহ্মণোচিত আচার-ব্যবহার দেখিয়া সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, নমঃশূদ্র জাতি প্রাচীন মুনিঋষির অর্থাৎ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের সন্তান। দ্বিতীয় কারণ এই যে, আমাদের জীবিকা নির্বাহের উপায় আর্য কৃষিকার্য, সেই প্রাচীন ও বর্তমান সময়ের মহাগৌরবের ব্যবসায়।

ও নমস্য কুলদর্পণ' নামক একটি গ্রন্থে অনুরূপ মত প্রকাশিত হয়। নমঃশূদ্র জাতির মধ্যে পূর্বে বিধবাবিবাহ প্রচলিত ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণত্বের দাবির সঙ্গে সঙ্গে সমাজে বিধবা বিবাহ নিরোধের জন্য একটি আন্দোলনও দেখা দিল।

শিক্ষার দাবি নমঃশূদ্রগণের পক্ষ হইতে উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং এপ্রিল, ১৯১৬ মাসের পতাকা পত্রিকায় লেখা হয় :

> ব্রিটিশ রাজের কৃপায় যাহা একটু জ্ঞানকণা লাভ করিয়াছি, তাহার দ্বারাই এখন জানিতে সমর্থ হইয়াছি—আমরা কি ও আমাদের শক্তি কতটুকু। ২৫ লক্ষ লোক লইয়া যে সমাজ গঠিত, সে সমাজ কখনই চিরকাল ঘুমাইয়া থাকিতে পারে না। হিন্দু সমাজের অন্ধ হিন্দু রাজের কৃপায় আমরা এতদিন ঘুমাইয়া ছিলাম। এখন জাতিভেদজ্ঞানশূন্য সমদর্শী বিপুল শক্তিশালী ব্রিটিশের কৃপায় জাগিলাম। ক্ষুদ্রচিত্ত ব্রাহ্মণকৃত আইনের শাসনে বাধ্য হইয়া আমাদের বাণী মন্দিরের চতুঃসীমানায়ও যাইতে দিতেন না। তোমার চিন্তা করিবার কি আছে? স্বয়ং ব্রিটিশ-রাজ অশিক্ষিতের বন্ধু, দরিদ্রের চিরসহায়, অনুন্নত জাতিসমূহের আশা-ভরসা তোমার সহায় হইবেন।

ঢাকা জেলার গেজেটিয়ারে দেখা যায়, হিন্দু সমাজের প্রতি বিরূপ হওয়ার ফলে এবং ইংরেজ সরকারের প্রদত্ত শিক্ষাদানের জন্য কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ নমঃশূদ্র জাতি ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিতে অস্বীকার করেন। নগরবাসী মজুমদার এবং রঘুনাথ সরকার নামে বিক্রমপুরের অধিবাসী দুই ভদ্রলোক পূর্ববঙ্গ ও আসামের তদানীন্তন ছোটলাট বাহাদুরকে জানান যে, নমঃশূদ্রগণ ব্রিটিশের সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করেন এবং সরকারের পক্ষেও তাঁহাদের জন্য শিক্ষা ও চাকুরি বিষয়ে বিশেষ দাবিগুলি স্বীকার করিয়া লওয়া উচিত। অক্টোবর, ১৯০৭ সালের নমঃশূদ্র সুহৃদ পাঠে জানিতে পারা যায় যে, নমঃশূদ্র জাতির পক্ষ হইতে প্রতিনিধিবর্গ ছোট লাট সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের চিরস্থায়িত্বের জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন।

"মুসলমানের জাতিভেদ"

হিন্দু সমাজে শিল্পী বা অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে আমরা যে সকল সমাজিক গতি লক্ষ্য করি, স্বভাবত উচ্চবর্ণের মধ্যে তদনুরূপ বিশেষ

কিছু আন্দোলন দেখা যায় না। তবে একেবারে যায় নাই, ইহাও বলা চলে না। কায়স্থগণ স্বীয় ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদনের জন্য এক সময়ে চেষ্টা করেন, বৈদ্য জাতিও ব্রাহ্মণত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যত্নবান হন। কিন্তু অজলচল অথবা অস্পৃশ্য জাতিবৃন্দের মধ্যে সামাজিক সংস্কারের জন্য যে উদ্‌গ্রীব আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক, মর্যাদাশীল ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থের মধ্যে অনুরূপ সংস্কারের তীব্রতা দেখা যায় না। তথাকথিত নিম্ন জাতিগুলি হিন্দু সমাজের মধ্যে থাকিয়া উচ্চবর্ণের সামাজিক রীতি-নীতি অনুকরণের দ্বারা মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিল; অপর পক্ষে ব্রাহ্মণাদি জাতির মধ্যে জাতীয় ঐক্য বা ন্যাশানালিজমের তাগিদে জাতিগত বন্ধন কিঞ্চিৎ শিথিল হইতে লাগিল। পূর্বে অসবর্ণ বিবাহে সমাজে যে উত্তেজনার সঞ্চার হইত স্বাধীনতার যজ্ঞে যখন দেশ উত্তরোত্তর অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন উচ্চবর্ণের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহের বিরুদ্ধে মনোভাবও আংশিকভাবে শিথিল হইয়া গেল।

ইতিমধ্যে কিন্তু বাঙলাদেশের হিন্দু সমাজের মত মুসলমান সমাজেও বিচিত্র কতকগুলি গতি পরিলক্ষিত হয়। সন ১৩৩৪ সালে (খৃঃ ১৯২৭) রাজারামপুর হাইস্কুলের ভূতপূর্ব হেডমাষ্টার মোহম্মদ ইয়াকুব আলী বি এ 'মুসলমানের জাতিভেদ' নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণয়ন করেন। বিভিন্ন পত্রিকায় ইহার সমালোচনা পাঠ করিয়া মনে হয়, বইখানি বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। বস্তুত ইহা সমাদরের যোগ্যও বটে। সেই পুস্তক হইতে বিভিন্ন অংশ উদ্ধৃত করিয়া আমরা পাঠকবর্গকে উপহার দিব। পাঠকও উপলব্ধি করিতে পারিবেন, নমঃশূদ্রগণের মধ্যে যে স্বতন্ত্রতার দাবি অস্ফুট আকারে দেখা দিয়াছিল, তাহা মুসলমান সমাজের ক্ষেত্রে আরও তীব্র আকার ধারণ করিয়া ভারতের উদীয়মান জাতীয় ঐক্যকে পঙ্গু করিবার সম্ভাবনা দেখা দিল। ব্রাহ্মণাদি বর্ণের মধ্যে ন্যাশনালিজমের তাগিদে জাতিগত ভেদ দূর করিবার যে ক্ষীণ সংস্কার চেষ্টা চলিতেছিল, ইংরেজ শাসনের আওতায় পুষ্ট ভেদমূলক আন্দোলনগুলি সেই ঐক্যচেষ্টাকে কতকাংশে পঙ্গু করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

মুসলমানের জাতিভেদ গ্রন্থের সমালোচনায় সওগাত পত্রিকা বলেন:

ইসলাম সাম্য—বিশ্বভ্রাতৃত্ববাদের ধর্ম। মানবশ্রেণীর মধ্যে জাতিভেদের প্রাচীর তুলিয়া উচ্চনীচের তারতম্য নির্দেশ করা ইসলাম সমর্থন ত করেই না। উপরন্তু জাতিভেদের ধ্বংসের উপরেই ইসলামের বুনিয়াদ গঠিত হইয়াছিল। ইসলাম অধ্যুষিত অন্য কোন দেশেই ইসলামপ্রচারিত এই সাম্যবাদের ব্যতিক্রম বড় হয় নাই। কিন্তু ভারতীয় মুসলমান সমাজের অবস্থা স্বতন্ত্র। এখানে হিন্দু প্রতিবেশীর প্রভাব প্রবল; ফলে হিন্দুদের দেখাদেখি এদেশের মুসলমান সমাজেও জাতিভেদের তারতম্য ঢুকিয়া পড়িয়াছে। হিন্দুদের ছোঁয়া-ছুঁয়ির কদর্যতম দিকটা এখনো মুসলমান সমাজে আমল না পাইলেও তাহাদের প্রাচীনত্বের কৌলিন্য গর্ব এবং ব্যবসাতে উচ্চ-নীচ বিভাগটা বেশ ঢুকিয়া পড়িয়াছে। কাপড় বোনার ব্যবসা করিয়া তাঁতীগণ, মাছের ব্যবসা করিয়া নিকারিগণ এবং এইরূপ আরও অনেক ব্যবসায়ী মুসলমানগণ, নিতান্ত অকারণে সমাজে নিগৃহীত অবস্থায় রহিয়াছেন। ফলে সাম্যবাদী মুসলমান সমাজেও আশরাফ—আত্‌রাফ নামক দুইটা শ্রেণীর সৃষ্টি করা হইয়াছে।

মূল পুস্তকখানিতে জনাব মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী লিখিতেছেন :

১৯১১ খৃষ্টাব্দের আদম সুমারী বিবরণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বঙ্গদেশীয় কর্তৃপক্ষ মুসলমানদিগকে শেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ ৮০ প্রকার জাতিতে বিভক্ত করিয়া ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোক-সংখ্যা ও তাহাদের জাতি নিরূপণ করিয়াছেন। কিন্তু এদেশে মুসলমানগণের এই প্রকার জাতিভেদ এক অভূতপূর্ব ঘটনা বলিয়া বোধ হয়। কারণ, পৃথিবী পৃষ্ঠে অপর কোন দেশে মুসলমান সমাজে এরূপ জাতিভেদ প্রচলিত নাই। — পৃ ১

পরিশিষ্ট হইতে তালিকাটি উদ্ধৃত করিতেছি: (১) আবদাল, (২) আজলাফ, (৩) আখুঞ্জি, (৪) বেদিয়া, (৫) বেহারা, (৬) বেলদার, (৭) ভাট, (৮) ভাটিয়া, (৯) চাটুয়া, (১০) চুরিহর, (১১) দফাদর, (১২) দাই, (১৩) দর্জি, (৪) দেওয়ান, (১৫) ধাওয়া, (১৬) ধোবা, (১৭) ধুনিয়া বা ধুনকার, (১৮) ফকির, (১৯) গাইন, (২০) হাজ্জাম,

(২১) জোলা, (২২) কাগাজি, (২৩) কালান, (২৪) কান, (২৫) কাস্‌বি, (২৬) কসাই, (২৭) কাজি, (২৮) খাঁ, (২৯) খোন্দকার, (৩০) কলু, (৩১) কুমার, (৩২) কুঁজরা, (৩৩) লালবেগী, (৩৪) মাহিফেরুশ, (৩৫) মাহিমল, (৩৬) মাল্লাহ্‌, (৩৭) মল্লিক, (৩৮) মসাল্‌চি, (৩৯) মেহ্‌তর, (৪০) মীর, (৪১) মির্জা, (৪২) মুচি, (৪৩) মোগল, (৪৪) নগার্চি, (৪৫) ননিয়া বা ননুয়া, (৪৬) নাস্যা, (৪৭) নাট, (৪৮) নিকারী, (৪৯) পাঠান, (৫০) পাওয়াবিয়া, (৫১) পীরকোদালী, (৫২) রাসুয়া, (৫৩) সৈয়দ, (৫৪) শেখ, (৫৫) সোনার, (৫৬) অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিঃ—(ক) আফগান, (খ) আশরাফ, (গ) বাকলি, (ঘ) বাখো, (ঙ) বাড়ি, (চ) ভুঁইয়া, (ছ) চৌধুরী, (জ) চুণারী, (ঝ) দফালি, (ঞ) গাড্ডি, (ট) গোলাম, (ঠ) হালালখোর, (ড) হিজরা, (ঢ) হোসেনী, (ণ) খরাদি, (ত) কোরেশী, (থ) লাহেরী, (দ) মাংটা, (ধ) মেহানা, (ন) মীরদেহ্‌, (প) মিরিয়াসিন, (ফ) মিঞা, (ব) নওমোস্‌লেম, (ভ) পাটেয়া, (ম) সুন্নি।—পৃ ৫৯

মুসলমান সমাজে জাতি গণনার তীব্র সমালোচনার পর লেখক বলিতেছেন

> কিন্তু এ অংশে মুসলমানের জাতিভেদ প্রকরণে কেবলমাত্র সেন্সাস কর্তৃপক্ষের দোষ নির্ণয়ে একদেশদর্শিতা প্রকাশ পাইবে। এ দেশীয় অজ্ঞ এবং অশিক্ষিত মুসলমানগণও প্রতিবেশী হিন্দুর জাতিভেদের অনুকরণে আপনাদিগের মধ্যে জাতিভেদ প্রচলনে চেষ্টিত দেখা যাইতেছে। ইহার কারণ এই যে বহু শতাব্দী যাবৎ হিন্দুর সহিত একত্র বসবাস করিয়া হিন্দুর প্রভাব মুসলমানের সমাজে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। অপরদিকে মুসলমানগণ সাধারণতঃ অশিক্ষিত বলিয়া ইসলামী আদর্শ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িতেছে।......অধিকন্তু যাঁহারা হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া স্বল্পকাল মুসলমান সমাজভুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা বংশ পরম্পরাগত জাতিভেদ সংস্কার প্রভাবে সাম্যবাদী মুসলমান সমাজেও জাতিভেদ প্রচলনে চেষ্টিত রহিয়াছেন। সুতরাং মুসলমান সমাজের অপরিচিত এই ভেদনীতি মূলে ভারতীয় মুসলমান সমাজে হিন্দু প্রভাবেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। — পৃ ১৬

ভেদনীতির কুফল বর্ণনা করিতে গিয়া লেখক বলিতেছেন :

সাম্যবাদী মুসলমান সমাজে অমুসলমানী প্রথায় জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত হইলে মুসলমানগণ হিংসা বিদ্বেষবশে পরস্পর কলহ বিবাদে লিপ্ত হইয়া পড়িবে এবং এই সামাজিক কলহের ফলে মুসলমানদিগের একতা লুপ্ত হইয়া তাহারা দুর্বল ও হীনবীর্য হইয়া পড়িবে। মুসলমানদিগের বর্তমান অবনতির দিনে তাঁহারা ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে নিতান্ত নিম্ন স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন এবং মাত্র দেড় শত বৎসর ভারতের সিংহাসনচ্যুত হইয়াই তাঁহারা তাঁহাদের ভূতপূর্ব প্রজা সাধারণ কর্তৃক নিরতিশয় নগণ্য ও হেয় বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদের মধ্যে সামাজিক বিচ্ছেদ সংঘটিত হইলে তাঁহারা নিতান্ত নিঃসহায় হইয়া তাঁহাদের ধ্বংসকামী সবলের কবলে পতিত ও নিপীড়িত হইবেন; এবং তদবস্থায় তাঁহাদিগকে ফেরাউনের হস্তে বন্দি ইসরাইলের ভাগ্য বরণ করিয়া লইতে হইবে। — পৃ ১৯

বঙ্গদেশে মৎস্য ব্যবসায়ী দীক্ষিত মুসলমানগণ মধ্যে যেরূপ হিন্দু জাতীয় নিকারী আখ্যা প্রচলিত আছে, সেইরূপ অন্যান্য দীক্ষিত মুসলমানগণের মধ্যে বিশ্বাস, মণ্ডল, প্রামাণিক প্রভৃতি হিন্দু আখ্যারও প্রচলন রহিয়াছে। কিন্তু এই সকল মুসলমান এ সম্বন্ধে ইসলামের বিধান সম্যক অবগত হইতে পারে নাই বলিয়া বর্তমান অবধি তাহাদের মধ্যে এই সকল হিন্দু আখ্যার বহুল প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়।.........জোলা, কলু, চাষা প্রভৃতি ব্যবসায়মূলক আখ্যাও বিধর্মীর হীন জাত্যর্থে মুসলমান সমাজে ব্যবহৃত হইতেছে; সুতরাং এ সকল আখ্যার প্রচলনও রহিত হওয়া কর্তব্য। — পৃ ৩৭

বর্তমান কালে হিন্দুগণ শিক্ষাদিতে উন্নত হইয়া বর্ণাশ্রমের গণ্ডিতে পদাঘাত পূর্বক ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চতম হিন্দুগণ মৎস্য ব্যবসায় পরিচালনা করিতেছেন। এবং সাম্যবাদী মুসলমানগণের কতকাংশ অশিক্ষার অন্ধকার কূপে পতিত হইয়া কোর্‌আন প্রশংসিত মৎস্য ব্যবসায় হেয় ভাবিয়া মৎস্য ব্যবসায়ী মুসলমানদিগের সহিত সামাজিক করণাদি বন্ধ করিতেছেন।—পৃ ৩৪

আজ-কাল অনেক হিন্দু-ঘেঁষা অজ্ঞ মুসলমান কৃষি শিল্প ব্যবসায়জীবী মুসলমানদিগের সহিত সমাজ করিতে নাসিকা কুঞ্চিত করেন। এবং হিন্দুর বর্ণভেদ প্রথার অনুকরণে ঐ সকল

মুসলমানের সহিত পানাহার করিতে বা একাসনে উপবেশন করিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। কোন কোন স্থলে ইহাও পরিলক্ষিত হয় যে, বংশাভিমানী মুসলমানগণ বিদ্যাশিক্ষার্থী মুসলমান ছাত্রদিগকে জায়গীর দান করিয়া কালক্রমে তাহাদিগকে চাষা, নিকারী, কলু বা জোলার সন্তান জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া আপনাপন বংশগৌরব বা শরাফত রক্ষা করিয়াছে! শুধু তাহাই নহে, যে আলেমগণ নবি করিমের খলিফা বলিয়া হাদিস শরীফে বর্ণিত হইয়াছেন, সেই আলেমগণ কৃষি শিল্প ব্যবসায়জীবীর বংশসম্ভূত হওয়ায় তাহারা তাঁহাদের পশ্চাতে নামাজ পড়িতেও অসম্মত হয়! এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, বাংলার এই ভুঁইফোড় আশরাফগুলি প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ সন্তান নয় কি? ভণ্ডামীর নীচতা বোধ হয় আর ইহা অপেক্ষা নীচে নামিতে পারে না। মূর্খগণ কোর্‌আন হাদিস খুলিয়া দেখুক, যে মুসলমান সমাজে তাহাদের এই ভণ্ডামীপূর্ণ শরাফতের স্থান নাই। — পৃ ৩৯

সুখের বিষয় ১৯৪৬ সালের হিন্দু মুসলমান বিরোধের পর হইতে শোনা যাইতেছে যে পূর্ববঙ্গে মুসলমানেরা মাছ ধরা, পানের চাষ করা, ক্ষৌরকর্ম বা রজকের কাজ প্রভৃতি যে সকল বৃত্তি অনুসরণ করিতেন না, এইবার স্বীয় সম্প্রদায়ের ঐক্য এবং উন্নতি বিধানের জন্য সে সকল বৃত্তি গ্রহণ করিতেছেন।

অর্থাৎ, যে বৃত্তিবিভাগ কুলগত করিয়া ভারতবর্ষ এক সময়ে শিল্প বাণিজ্যে উন্নত হইয়াছিল এবং মুসলমান শাসন প্রবর্তনের পরেও যাহা শহরে আংশিক আঘাতপ্রাপ্ত হইলেও গ্রামদেশে টিঁকিয়া গিয়াছিল, কিন্তু যাহা ব্রিটিশ ধনতন্ত্রের আঘাতে ভগ্নদশা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইতে মুক্তিলাভের জন্য হিন্দু সমাজের মধ্যে জাতিভেদের সংস্কার চেষ্টা আমরা দেখিতে পাই। মুসলমান সমাজের মধ্যেও তেমনি তাহার নাগ-পাশ হইতে মুক্তির একটি তীব্র আকাঙ্ক্ষা পরিলক্ষিত হয়। সকলেই বৃত্তিতে কুলগত অধিকার ভাঙিয়া স্বাধীনতা আনিবার চেষ্টা করিতেছে, সকলেই কুলগত বৃত্তিনিচয়ের মধ্যে সামাজিক মর্যাদার তারতম্য সমূলে বিনাশ করিয়া উচ্চতম জাতি যে মর্যাদা অধিকার করিয়া আসিতেছিল, তাহাই আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে।

উপসংহার

হিন্দুসমাজের গঠনকৌশল বুঝিবার চেষ্টায় আমরা বহু তথ্যের অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি। আমাদের ইতিহাস প্রাচীন, এবং বহু লোক লইয়া তাহার কারবার। অল্প কথায় বা সংক্ষেপে ভারতবর্ষের সমাজগঠনের ধারা অথবা তাহার পরিণতির আলোচনা করা দুরূহ ব্যাপার। তাহা সত্ত্বেও আমরা পাঠকবর্গকে হিন্দুসমাজের জটিলতা এবং তাহার গতির সহিত পরিচিত করাইবার জন্য যথাসম্ভব তথ্যপ্রকাশ ও আলোচনার চেষ্টা করিয়াছি। সুধী পাঠক ইহা হইতে নূতন কোনও দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান পাইয়া থাকিলে, অথবা চিন্তার নূতন কোনও খোরাক পাইয়া থাকিলে নিজেকে ধন্য বলিয়া মনে করিব। এখন যে চিত্র বিগত প্রবন্ধাবলীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহারই সার সংকলন করিয়া পাঠকের নিকট বিদায় লইব।

প্রথমেই চোখে পড়ে, ভারতবর্ষীয় সমাজ বহু জাতির সংশ্লেষের দ্বারা রচিত হইয়াছে। অপরাপর দেশেও তাহাই হয়, এবং বিজেতা জাতির প্রভাবে বিজিত জাতি অনেক ক্ষেত্রে স্বীয় রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলে। একে অপরকে শোষণ করিয়া নূতন একটি উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা নির্মাণ করে। আবার দিন যায়, উৎপাদনের নূতন এক কৌশল অধিকৃত হওয়ার ফলে আবার মানুষে মানুষে সম্পর্কের হেরফের হয়। ভারতবর্ষে যে তেমন হয় নাই, তাহা নহে। তাহাই ঘটিয়াছে, কিন্তু ইহার মধ্যেও ভারতবর্ষের প্রতিভা এক নূতন দিকে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল; যাহার ফলে নানা রাজনৈতিক উত্থানপতন ও ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্যেও ভারতবর্ষ স্বীয় সংস্কৃতিকে মরণের অপঘাত হইতে বাঁচাইতে সমর্থ হইয়াছিল।

সেই কৌশলটি আমরা বর্ণব্যবস্থার মধ্যে দেখিতে পাই। প্রাচীন ভারতীয় সমাজতত্ত্ববিদগণের মতে বর্ণব্যবস্থা সকল সমাজেই প্রযোজ্য। যেখানেই বহু জাতি মিলিত হইতেছে, তাহাদিগকে চারি মৌলিক বর্ণে

স্থান দিয়া, সংশ্লিষ্ট করিয়া একটি বৃহত্তর সমাজ গঠন করা যায়। সমাজের প্রয়োজনে, স্বীয় গুণ বা প্রতিভা অনুসারে যে যে-কাজ করে, সে যদি সেই কাজেই নিযুক্ত থাকে, এবং সমাজও যদি এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে যে সে-ব্যক্তি বা তাহার পরে অনুরূপ বৃত্তিধারী ব্যক্তি অনাহারে মরিবে না, সকলে পরস্পরের সহযোগিতার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করিবে, তাহা হইলে পরস্পরের বাহুবন্ধনে যে দৃঢ় সমাজ গড়িয়া উঠে, তাহার শক্তি বেশি হয়। উপরন্তু গ্রাম্য সমাজে এই সহযোগিতার অতিরিক্ত আরও একটি ব্যবস্থার দ্বারা মানুষকে পরম আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল। যে যে-সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত, তাহার কুল বা জাতির আচার যেমনই হউক না কেন, সে সেই আচার বজায় রাখিয়াও হিন্দু সমাজে স্থান পাইত। কেবল গো-হত্যা, নরবলি বা ব্রাহ্মণসমাজে ঘৃণার্হ বলিয়া গণ্য কোনও আচার থাকিলে, তাহাকে পরিমার্জিত করিয়া লওয়া হইত।

বর্ণগত সমাজের অন্তরে যে অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড বর্তমান ছিল, এবং স্বধর্ম পালনের যে আশ্বাস বহু জাতি লাভ করিয়াছিল, তাহারই কারণে ভারতীয় সমাজে বিজিতের বিদ্রোহ দেখা দেয় নাই; অথবা দেখা দিলেও বেশি দূর পর্যন্ত তাহা অগ্রসর হইতে পারে নাই। অথচ ব্রাহ্মণশাসিত সমাজে আপত্তি বা বিদ্রোহের কোনও কারণ ছিল না, এমন মনে করিবার হেতু নাই। সকল দেশের বিজেতাগণ যাহা করিয়া থাকেন, ভারতীয় সমাজেও তাহার প্রমাণ স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। বিজেতাগণ স্বীয় শ্রেণীগত স্বার্থপুষ্টির জন্য পরিশ্রমের ভার উত্তরোত্তর শূদ্রবর্ণের উপরে চাপাইয়া দিতে লাগিলেন; বিজিত জাতির পুরোহিত-কুলকে ব্রাহ্মণবর্ণে স্থান দিলেও নিম্নপদবীর অধিকারী করিয়া রাখিলেন এবং নিম্নবর্ণকে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ এবং যোগতপের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলেন। অবশ্য শূদ্রকুল লুকাইয়া দ্বিজের অধিকার ভূমিতে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেন; কিন্তু ফলে তাঁহাদের শম্বুকের দশালাভ করিতে হইত।

বুদ্ধদেব শূদ্র এবং স্ত্রীজাতির মুক্তির অধিকার স্বীকার করার ফলে ভারতবর্ষে পরবর্তীকালে যে বিপুল প্রাণশক্তির সঞ্চার ঘটিল, যাহার

ফলে স্থাপত্যে শিল্পে ধর্মান্দোলনে সৃজনীপ্রতিভার প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হইল, তাহা হইতেই বুঝা যায়, কতখানি সৃজনীপ্রতিভা সমাজের অবজ্ঞাতস্তরে এতদিন অনাদৃত অবস্থায় চাপা পড়িয়া ছিল।

অথচ ব্রাহ্মণদের মতলব যে কেবল খারাপই ছিল, এমন ভাবিবার কোনও হেতু নাই। তাঁহারা বর্ণব্যবস্থার অন্তর্বর্তী অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড স্থাপন এবং স্বধর্মে অধিকারের স্বীকৃতির ভিতর দিয়া যে ঔদার্য এবং গঠনকুশলতা দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। দুঃখ এইখানে যে, তাঁহারা বিজিতকে ঠিক নিজেদের সমান আসন দিতে সমর্থ হন নাই। সেই ভেদবিষে সংশ্লেষমূলক সমাজের দেহ উত্তরোত্তর দুর্বল ও পঙ্গু হইয়া পড়িল। তেমন সমাজের বিভিন্ন জাতি একত্র হইয়া বাহিরের শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। সমগ্র সংশ্লিষ্ট সমাজের বৃহত্তর ঐক্য মানুষের চোখে বেশি ধরা পড়ে নাই, প্রত্যেকে স্বীয় ক্ষুদ্রতর স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করিয়া অবশেষে গোটা হিন্দুসমাজকে পরাধীনতার শৃঙ্খল পরাইয়া ছাড়িল।

সংশ্লেষের যে আদর্শ লইয়া হিন্দুসমাজ রচিত হইয়াছিল, উৎপাদন ব্যবস্থাকে একান্তভাবে কুল বা জাতিগত বৃত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে চেষ্টা দেখা গিয়াছিল, কার্যত তাহা কিন্তু কোনদিনই ষোল আনা প্রতিপালিত হয় নাই। এক জাতি হইতে অপর জাতিতে পরিণত হওয়ার ইতিহাস আজও বিরল নহে, পূর্বকালেও বিরল ছিল না। বৃত্তির পরিবর্তন, স্থানান্তরে গমন ও বসবাস, আচারভ্রষ্ট হওয়ার কারণে অথবা শুদ্ধতর আচার গ্রহণের ফলে নূতন নূতন জাতির উদ্ভব হইয়াছে; কিন্তু সকলে মৌলিক নীতি দুইটিকে মানিয়া চলিয়াছে। দেশাচার বা লোকাচার পালনের স্বাধীনতা ও বৃত্তিতে কুল বা জাতিগত অধিকারের বিরুদ্ধে কেহ আপত্তি করে নাই।

সেইজন্য মুসলমান অধিকারকালে যখন রাজশক্তি অন্য পথে চলিল, যখন সমাজের শিক্ষিত চাকুরিজীবী মুসলমান সরকারের নিকট প্রীতি-লাভের চেষ্টা করিতেছিল, তখনও গ্রাম্যসমাজে বর্ণব্যবস্থার মেরুদণ্ড অভগ্ন থাকার কারণে হিন্দুসভ্যতা টিঁকিয়া গিয়াছিল। যে সকল দরিদ্র, শোষিত শূদ্র জাতি অত্যাচারিত হইত, বৃত্তিমূলক বর্ণব্যবস্থা

বজায় রাখার ব্যাপারে, পরস্পরের মধ্যে ছুৎমার্গ, উচ্চনীচ বোধ কায়েমী রাখার বিষয়ে, তাহাদেরও উৎসাহের অভাব ছিল না। আজও যখন অস্পৃশ্যতা বর্জনের আন্দোলন চলিতেছে, তখন হাড়ি, ডোম, বাগদি প্রভৃতি জাতি ব্রাহ্মণ কায়স্থের সহিত মর্যাদার সমত্ব লাভে খুশি হইলেও পরস্পরের মধ্যে পুরাতন সম্পর্ক পরিবর্তন করিতে আগ্রহান্বিত হয় না। অর্থাৎ শোষিতগণের মধ্যে বর্ণব্যবস্থার প্রতি আনুগত্যের ন্যূনতা যথোপযুক্তভাবে আজও ঘটে নাই।

ইহার জন্য শুধু ব্রাহ্মণের কূটকৌশলী বুদ্ধিকে নিন্দা করিয়া লাভ নাই, বরং এই আনুগত্যের মূল ও বিদ্রোহের অভাবের মৌলিক কারণকে বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই, উচ্চবর্ণই হউক বা নিম্নবর্ণই হউক, প্রতি জাতিই সংশ্লেষণপ্রসূত হিন্দুসমাজের মধ্যে যে আর্থিক ভাগ্যের স্থিরতা ও আচারপালনের স্থির অধিকার পাইত, তাহারই জন্য মোটের উপরে খুশি মনে থাকিত। নানক, চৈতন্যদেব অথবা রামমোহন ভেদনীতি বর্জন করিয়া যখন সামাজিক সমতা এবং জাতির পরিবর্তে ব্যক্তিগত গুণ ও কর্মকে সমধিক মর্যাদা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন শুধু ব্রাহ্মণ নহে, আপামর জনসাধারণ তাহাদিগকে বৃহৎ হিন্দুসমাজের মধ্যে নূতন একটি জাতিতে পরিণত করিয়া মহাপুরুষদের সংস্কারচেষ্টাকে পরাস্ত করিয়াছিল। বৈষ্ণবকে আমরা 'বোষ্টম' নামক এক জাতিতে পরিণত করিয়াছি। শিখ এবং ব্রাহ্ম সমাজকেও আমরা প্রায় একটি 'জাতি'তে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছিলাম, যাহার বিবাহ একান্তভাবে স্বীয় সমাজের মধ্যেই আবদ্ধ।

ইহার মূলে শুধু ব্রাহ্মণের শঠতা অথবা শূদ্রগণের অন্ধ কুসংস্কার আছে বলিয়া নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই। জগতের অন্যত্র যেরূপ সামাজিক বিদ্রোহ ঘটিয়াছে, ভারতবর্ষে তাহা শুধু জাতীয় নিবীর্যতার কারণে ঘটে নাই বলিলে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দায় হইতে খালাস পাওয়া যায় না। মূলে রহিয়াছে, আপামর সাধারণের মনে বর্ণব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য। বর্ণব্যবস্থার অর্থনৈতিক ভারকেন্দ্রের স্থৈর্যের বশেই ভারতীয় সংস্কৃতির স্থৈর্য সম্ভব হইয়াছিল। এই মৌলিক সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করিবার বিশেষ আবশ্যকতা আছে।

অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া ইউরোপের নূতন উৎপাদন ব্যবস্থার সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতের পুরাতন ধনতন্ত্রের পরাজয় আরম্ভ হইয়াছে। আজও বৃত্তিতে কুলগত অধিকার অভ্যাসবশে স্বীকৃত হইলেও অধিকাংশ জাতির বেলায়, এবং দেশের প্রায় সকল গ্রামে, প্রাচীন উৎপাদনব্যবস্থা কমবেশি ওলটপালট হইয়া গিয়াছে। এবং এই বিপর্যয়ের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ পূর্বে বর্ণব্যবস্থার প্রতি যে আনুগত্য ছিল, আজ তাহা দ্রুত ভাঙিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইংরেজী শিক্ষার প্রসারেই যে আমাদের মধ্যে সমাজসংস্কারের বুদ্ধি আসিয়াছে তাহা নহে। এ কথা শুধু আংশিকভাবেই সত্য। যদি পুরাতন বৃত্তির আশ্রয়ে মানুষ আজও সুখে স্বচ্ছন্দে খাওয়াপরা চালাইতে পারিত তবে ইংরেজী শিখিয়াও তাহারা বর্ণব্যবস্থাকে ভাঙিতে চাহিত না। ভারতবাসী শিক্ষিত সমাজ এক সময়ে ফারসীনবিশ হইয়াছিল, কিন্তু তাহার দ্বারা সমাজের উপরস্তরে কিছু পরিবর্তন সাধিত হইলেও গভীরস্তরে সে প্রভাব পৌঁছায় নাই। শুধু তাহাই নহে। অনেকের ধারণা, হিন্দু সমাজের শোষণ এবং অবমাননা নীতির ফলেই নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বহু মানুষ ইসলামে দীক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে এই যুক্তি আমার নিকট সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। যাহারা জাতিগত বৈষম্যের নাগপাশ হইতে মুক্তিলাভের জন্য ধর্মান্তরিত হইল, তাহারা মুসলমান হইয়াও উচ্চনীচ ভেদাভেদ এবং ব্যবসায়ে কুলগত অধিকার গ্রাম্য সমাজে বজায় রাখিল কেন? সম্ভবত অন্য কারণে তাহারা মুসলমান হইয়াছিল। তাই মনে হয়, মুসলমানী আমলেও হিন্দুসমাজের অন্তর্গত আর্থিক সংগঠনের স্থৈর্যই ধর্মান্তরিত হিন্দুর মধ্যে ইসলামের সমতা-বুদ্ধিকে সম্যক্‌ভাবে বিকীর্ণ হইতে দেয় নাই।

পারিতেছে না, শুধু আজ। এবং তাহার কারণও বলা হইয়াছে, পুরাতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরাজয়।

গীতায় একটি কথা আছে—সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ। আমরা ইউরোপীয় ক্যাপিট্যালিজমের আজ প্রভূত নিন্দা করিতেছি; তাহার মধ্যে যে সামাজিক বৈষম্য ও শোষণ রহিয়াছে, সেই পাপ হইতে মানবসমাজকে আমরা বাঁচাইতে চাই। কিন্তু ইউরোপীয়

ধনতন্ত্র মানুষের লোভ এবং স্বার্থবুদ্ধির পোষণকে আশ্রয় করিয়াও জগতের উৎপাদনব্যবস্থাকে আরও অধিক ফলপ্রসূ করিয়াছে, ইহা তো অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাহার দোষ কাটাইতে হইলে আমরা ইউরোপীয় ধনতন্ত্রের যন্ত্রগুলিকে গ্রহণ করিয়া হয়তো তাহার পরিচালনব্যবস্থায় সংস্কার আনিতে পারি, আনুষঙ্গিক দোষগুলি কাটাইতে পারি। কিন্তু তাহার মূলে যদি স্বর্ণসম্ভার থাকে, সে স্বর্ণকে উপেক্ষা করিব না; বরং পুরাতন সোনার অলঙ্কারকে গলাইয়া নূতন রূপে তাহাকে ঢালিয়া লইব।

বর্ণব্যবস্থার সম্বন্ধেও সে কথা বলা চলে। শোষণ, মনুষ্যত্বের অবমাননা, সবই ইহার সহিত জড়িত ছিল। কিন্তু বর্ণব্যবস্থার মূলে একটি বুদ্ধি ছিল, মানুষ সমাজের দাস। সমাজের জন্য নির্ধারিত সেবা করিয়া কামার, কুমোর, ধোপা, নাপিত, ব্রাহ্মণ, জ্যোতিষী স্বীয় জীবন-যাপন করিয়া থাকে। সমাজকে তাহারা দেখে এবং সমাজও তাহাদের দেখে। অধিকার এবং দায় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তদুপরি, বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন কুলের, এমন কি বিভিন্ন মানুষের স্বধর্ম পালনের অধিকার আছে। এই দুইটি মূলনীতির উপরে রচিত হিন্দুসমাজ সংশ্লেষের দ্বারা ভারতবর্ষকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করিয়াছিল, তাহাতে কোনও সংশয় নাই।

সে সংশ্লেষে কোথায় দোষ, তাহা বলিয়াছি। কিন্তু দোষ ছিল বলিয়া গুণের প্রতি আমরা দৃক্‌পাত করিব না, ইহাও উচিত নহে। শ্রেণী-শোষণ ভিন্ন ভারতীয় উৎপাদনব্যবস্থা জড়তা দোষযুক্তও হইয়া পড়িয়াছিল। হয়তো ইউরোপীয় ধনতন্ত্রের প্রভাবে, মানুষের মৌলিক স্বার্থবোধ আজ সুযোগ পাইয়া পুরাতন ব্যবস্থার জড়তাকে ভাঙিয়া ফেলিতেছে। কাঁটা দিয়াই কাঁটা তোলা যায়। রজোগুণ মিশ্রিত তামসিকতার অসির দ্বারাই জাতিভেদের তমোমূলক জড়তার বন্ধন ছিন্ন হইতেছে। কিন্তু আজ ধনতন্ত্রপ্রদত্ত মুক্তি ও উৎপাদনব্যবস্থার অধিক ফলপ্রসব করিবার ক্ষমতা দেখিয়া আমরা যেন না ভাবি, যাহা পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছি, তাহার সবই ধূলা, সবই বালি। তাহার

মধ্যেও যে সোনার দানা আছে, এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমার উদ্দেশ্য।

ধনতন্ত্রের অপভ্রংশের উপর রচিত অধুনাতন ভারতীয় সমাজে আবার আমাদের নূতন করিয়া শিখাইতে হইবে যে, মানুষ সমাজের নিকট ঋণী। সে ঋণ প্রাচীনেরা যেভাবে স্বীকার করিতেন আমরা সে ভাবে স্বীকার না করিয়া হয়তো নূতনভাবে স্বীকার করিব। কিন্তু দায় আমাদের আছে; এবং সেই দায়ের উপরেই আমাদের অধিকারও প্রতিষ্ঠা লাভ করে, এই পুরাতন সত্যটি যেন আমরা বিস্মৃত না হই।

দ্বিতীয়ত, ব্যক্তির স্বাধীনতা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে। প্রাচীন ভারতবর্ষে স্বধর্মে অধিকার দিয়া প্রাচীন ব্যবস্থাপকগণ এই অধিকারের স্বীকৃতি করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা অত্যাশ্চর্য এক ব্যবস্থার প্রবর্তনও করিয়াছিলেন। মানুষ যতক্ষণ সমাজে থাকে ততক্ষণ সে সম্পূর্ণ সমাজের দাস। কুলাচার ও লোকাচার পালন করিবার স্বাধীনতা অবশ্য তাহার আছে; কিন্তু বৃত্তি পরিহারের স্বাধীনতা তাহার নাই। কিন্তু এই বন্ধনের ঊর্ধ্বে আরও একটি নীতি প্রাচীন হিন্দুগণ স্বীকার করিতেন। যেব্যক্তি সন্ন্যাস গ্রহণ করে, পরিব্রাজক হয়, তাহাকে গৃহস্থের শেষ কর্তব্য অগ্নিরক্ষণের দায় হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়। সে বিরজা হোম করিয়া আত্মার প্রতি শেষ নৈবেদ্যও স্বহস্তে সারিয়া ফেলে। অতঃপর তাহার পূর্বাশ্রমের সঙ্গে যোগসেতু বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, নামগোত্র লুপ্ত হয়, এবং সে নিকেতনবিহীন হইয়া চলে। সমাজ তাহার উপরে কোন দাবি রাখে না। সেও সমাজের প্রদত্ত ভিক্ষান্ন ভিন্ন অপর কিছু গ্রহণ করিতে পারে না।

অর্থাৎ প্রাচীন বর্ণব্যবস্থাযুক্ত হিন্দুসমাজে আমরা ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ সমাজের দাসে পরিণত করিবার যে বুদ্ধি দেখি, তৎসহ ইহাও দেখি, ব্যক্তিও যাহাতে বিনষ্ট না হয়, তাহার মৌলিক প্রতিভা বিকাশের জন্য, সন্ন্যাসের খিড়কি দরজা দিয়া মুক্ত আকাশের তলে দাঁড়াইবার একটা ব্যবস্থাও প্রাচীনগণ নির্মাণ করিয়া গিয়াছিলেন।

প্রাচীন সমাজের বিচারে আমরা তাহার শোষণের দিকে কেবল না দেখিয়া, বরং যদি বৈজ্ঞানিকদৃষ্টি লইয়া শোষণকে শোষণই বলি, কিন্তু

উদ্ধারের যোগ্য কোনও অমূল্য সম্পদ থাকিলে তাহাকে সংগ্রহ করিতে লজ্জিত না হই, তবেই আমরা প্রকৃত লাভবান হইব।

ইউরোপীয় ধনতন্ত্রকে গালি দিব না। তাহা যেখানে মানবসমাজের বৈষয়িক সম্পদবৃদ্ধির ব্যাপারে সহায়তা করিয়াছে, সেখানে তাহার যোগ্য প্রশংসা করিব। কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আতিশয্যের দ্বারা তাহা যে ক্ষতিসাধন করিয়াছে, সে সম্বন্ধেও আমরা অবহিত থাকিব। তেমনই আবার প্রাচীন বর্ণব্যবস্থার মধ্যে যেখানে দোষের যাহা আছে, তাহাকে ক্ষমা করিব না। কিন্তু প্রাচীন উৎপাদনব্যবস্থা ও জাতিসংশ্লেষ, অথবা সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণে যদি কিছু ভাল পাই, যাহা আজও আমাদের প্রয়োজনে লাগিতে পারে, তবে অবশ্যই তাহা গ্রহণ করিব।

আজ ধনতন্ত্রের মৌলিক আত্মকেন্দ্রিকতার প্রতিক্রিয়ায় আমরা সমাজকেন্দ্রিকতার অভিমুখে ছুটিয়াছি। ইহার উৎসাহে আজ পৃথিবীতে ব্যক্তিত্বকে অত্যধিক সঙ্কুচিত করিয়া পিপীলিকার মত সমাজরচনার সম্ভাবনা দেখা দিতেছে। কিন্তু পঙ্গু ব্যক্তিত্বের বনিয়াদের উপরে রচিত সমাজ সত্যসত্যই মনুষ্যত্ব বিকাশের পথে সহায় হইতে পারে না। হয়তো, প্রাচীন ভারত হইতে আমরা এইরূপ অপঘাত হইতে বাঁচিবার একটি বিধি সংগ্রহ করিতে পারি। এইরূপে, বৈজ্ঞানিকপন্থায় ইতিহাস পর্যালোচনার ফলে যদি আমরা স্থিরবুদ্ধি হইয়া, ভাববিলাসী না হইয়া, স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়ার অভ্যাস করি, তবে যে ধূম সকল কর্মের সহিত সংযুক্ত থাকে সেই ধূমের আবরণের নিম্নে সত্যের জ্বলন্ত অগ্নিশিখাকে আবিষ্কার করিতে শিখিব।

বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন কালে, মানুষ নানা পরীক্ষা, নানা সমাজ-ব্যবস্থা রচনা করিয়াছে, তাহা লইয়া পরীক্ষা করিয়াছে, স্থায়ী সমাজ-রচনার চেষ্টার দ্বারা মানুষকে সুখী করিবার চেষ্টা করিয়াছে। ভারতের পুরাতন সমাজে যাহা ধূম তাহাকে পরিহার করিয়া যদি আমরা সেই অগ্নিকে আজিকার দিনে মানবসমাজের মঙ্গলের জন্য প্রয়োগ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের জ্ঞান সার্থক হইবে।

পৃথিবীর ইতিহাসে পূর্বে এক সময়ে নদীর কূল বৃক্ষরাজিতে আচ্ছন্ন ছিল। সে বনানী আজ নাই, কিন্তু বৃক্ষদেহের অভ্যন্তরে যে

দাহ্য পদার্থ সঞ্চিত থাকে তাহা ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া অবশেষে কয়লার আকারে রূপান্তরিত হইয়াছে। প্রাচীন গাছের অবশেষ বলিয়া তাহাকে আমরা উপেক্ষা করি না, সেই কয়লার সাহায্যে আজ সভ্য জগতের অনেক কার্যসিদ্ধি হয়। পুরাতন বর্ণব্যবস্থা যে সময়ে গঠিত হইয়াছিল, সে দিন আর ফিরিয়া আসিবে না। ফিরিয়া আসিলেও সুবিধা হইবে না; কারণ মানুষের সংখ্যা আজ বাড়িয়াছে। অন্তত ভারতে জনপিছু ভূমির পরিমাণ অসম্ভবরকম কমিয়া গিয়াছে। তবু সেই সময়কার ব্যবস্থার অন্তরে যদি বর্তমানের প্রয়োগযোগ্য কোনও নীতি, কোনও বুদ্ধি, আমরা আবিষ্কার করিতে পারি, তবে তাহা বর্তমানকালের উপযোগী হইলে সে ব্যবস্থাকে প্রয়োগ না করিলে আমরা মূর্খতার পরিচয় দিব।

মানবজাতিকে দেশ এবং কালের ব্যবধানের দ্বারা বিচ্ছিন্ন করা যায় না। একমেবাদ্বিতীয়ম্।